জাতিস্মর

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

নূতন সংস্করণ :
৭ই আষাঢ়, ১৩৬৩

২ টাকা

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বি. এ.
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য
প্রভু প্রেস
৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

ভূমিকা
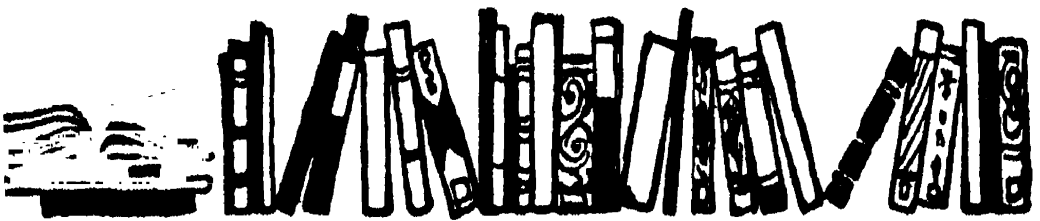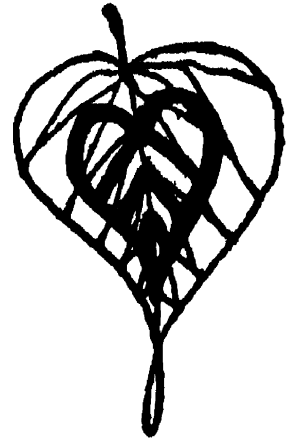
তিনটি ইতিহাসগন্ধী গল্প এই গ্রন্থে স্থান পাইল। সবগুলিই ইতিপূর্বে সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে, স্থানে স্থানে সামান্য পরিবর্তন করিয়াছি।

জাতিস্মর শ্রেণীর গল্প বাংলাভাষায় নূতন হইলেও বিদেশী সাহিত্যে নূতন নয়। আমি যতদূর জানি, বিখ্যাত মার্কিন গাল্পিক জ্যাক্ লণ্ডন্ ও সর্ববিদিত ইংরাজ সাহিত্যিক স্যার আর্থার কোনান্ ডয়েল্ এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক; জাতিস্মরের মুখ দিয়া গল্প বলাইবার চেষ্টা তাঁহাদের পূর্বে আর কেহ করেন নাই। এই দুই স্বর্গীয় লেখকের নিকট আমার ঋণ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি।

'অমিতাভ' গল্পের মূলে একটুখানি পৌরাণিক কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই নাই। 'মৃৎপ্রদীপের' আখ্যান-বস্তু সম্পূর্ণ কাল্পনিক—কেবল কুমারদেবী, চন্দ্রগুপ্ত, চন্দ্রবর্মা, সমুদ্রগুপ্ত এই নামগুলা ঐতিহাসিক। চন্দ্রবর্মার দিগ্বিজয় যাত্রাও সত্য ঘটনা। 'রুমাহরণ' গল্পে মানব-সভ্যতার গোড়ার কথাটা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

ইতিহাসের ঘটনাকে যথাযথ বিবৃত করাই ঐতিহাসিক গল্পের উদ্দেশ্য বলিয়া আমার মনে হয় না। তাৎকালিক আবহাওয়া যদি কিছুও সৃষ্টি করিতে পারিয়া থাকি, তবেই উদ্যম সার্থক হইয়াছে জানিবে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ও বাৎস্যায়নের কামসূত্র হইতে এই বিষয়ে অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচীন শব্দের অর্থ

অষ্টশীল—বৌদ্ধধর্মে গৃহীদের জন্য পালনীয় অষ্টবিধ নীতি। Eight Commandments : চুরি করিবে না , জীবহত্যা করিবে না, ইত্যাদি।

অর্হৎ—যিনি বৌদ্ধ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন ; সিদ্ধ পুরুষ।

ইন্দ্রকীলক—হুড়কা।

ইন্দ্রকোষ—দুর্গপ্রাকারের উপর একপ্রকারের স্তম্ভ। ভিতর হইতে তীর মারিবার জন্য ইহার গায়ে ছিদ্র থাকিত।

ঔদকদুর্গ—নদীর মোহানায় বা জলবেষ্টিত স্থানে নির্মিত পরিখাযুক্ত দুর্গ।

কঞ্চুকী—রাজ-অন্তঃপুরের রক্ষক।

কুলিক—শিল্পী বা শ্রমিকদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি (foreman)।

ক্ষত্রপ—রাজপ্রতিনিধি (satrap)।

গুল্ম—ছোট ছোট সেনানিবাস, ঘাঁটি।

গোষ্ঠীসমবায়—জ্ঞাতিদের সম্মেলন।

জয়স্কন্ধাবার—কোন দেশ জয় করিবার পর সেই দেশে স্থাপিত তাৎকালিক সামরিক রাজধানী।

ত্রি-শরণ—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' ইত্যাদি মন্ত্র।

ধর্মচক্র—বৌদ্ধ ধর্মারম্ভের চিহ্ন।

নবপত্রিকা—প্রস্তর-শিল্প।

পট্টমহাদেবী—পাটরাণী।

পত্রচ্ছেদ্য—দেহে চন্দন-কুঙ্কুম প্রভৃতি দ্বারা চিত্র অঙ্কন ; প্রসাধনের অঙ্গ।

পরমভট্টারিকা—রাণী বা রাজকুলোদ্ভবা মহিলার সম্ভ্রমসূচক আখ্যা।

পরিব্রাজিকা—রাজ-অবরোধের নারী অধ্যক্ষ।

মাৎস্যন্যায়—রাষ্ট্রবিপ্লব ; অরাজকতা।

লৌহজালিক—লোহার জাল দিয়া তৈয়ারী অঙ্গত্রাণ (chainmail)।

শ্রেণী—কর্মিক সমবায়।

সমাপানক—মজলিস, যেখানে বসিয়া সকলে সুরাপান করিত।

সংঘাটি—ভিক্ষুর পরিধেয় তিনটি বস্ত্রখণ্ডের একটি ; কটিবাস।

সংবাহক—যে ভৃত্য হাত-পা টিপিয়া দেয়।

সান্ধিবিগ্রহিক—সমরসচিব। হস্তিনখ—বুরুজ (bastion)।

অমিতাভ

যত অসম্ভব কথাই বলি না কেন, যদি একজন বড় পণ্ডিতের নাম সেই সঙ্গে জুড়িয়া দিতে পারি, তবে আর কথাটা কেহ অবিশ্বাস করে না। আমি যদি বলি, আজ রাত্রিতে অন্ধকার পথে একেলা আসিতে আসিতে একটা ভূত দেখিয়াছি, সকলে তৎক্ষণাৎ তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবে; বলিবে,—"বেটা গাঁজাখোর, ভেবেছে আমরাও গাঁজা খাই!" কিন্তু সার্ অলিভার লজ্ যখন কাগজে-কলমে লিখিলেন, একটা নয়, লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি ভূত দিবারাত্রি পৃথিবীময় কিলবিল করিয়া বেড়াইতেছে, তখন সকলেই সেটা খুব আগ্রহ সহকারে পড়িল এবং গাঁজার কথাটা একবারও উচ্চারণ করিল না।

এটা অবিশ্বাসের যুগ—অথচ মানুষকে একটা কথা বিশ্বাস করানো কত না সহজ! শুধু একটি পণ্ডিতের নাম—একটি বড়সড় আধুনিক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত,—সেকেলে হইলে চলিবে না এবং দেশী হইলে তো সবই মাটি!

তাই ভাবিতেছি, আমি যে জাতিস্মর এ কথা কেমন করিয়া বিশ্বাস করাইব? কোন্ বিদেশী বৈজ্ঞানিকের নাম করিয়া সন্দেহ-দ্বিধা ভঞ্জন করিব? আমি রেলের কেরানী, বিদ্যা এণ্ট্রান্স্ পর্যন্ত। তের বৎসর একাদিক্রমে চাকরি করিবার পর আজ ছিয়াত্তর টাকা মাসিক বেতন পাইতেছি—আমি জাতিস্মর! হাসির কথা নয় কি?

রেলের পাস পাইয়া যে বৎসর আমি রাজগীরে ভগ্নাবশেষ দেখিতে যাই—ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন ইষ্টকস্তূপের উপর

দাঁড়াইয়া সেদিন প্রথম আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে কালের যবনিকা সরিয়া গিয়াছিল। যে দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, তাহা কতদিনের কথা! দু' হাজার বৎসর, না তিন হাজার বৎসর? ঠিক জানি না। কিন্তু মনে হয়, পৃথিবী তখন আরও তরুণ ছিল, আকাশ আরও নীল ছিল, শষ্প আরও শ্যাম ছিল।

আমি জাতিস্মর। ছিয়াত্তর টাকা মাহিনার রেলের কেরানী—জাতিস্মর! উপহাসের কথা—অবিশ্বাসের কথা। কিন্তু তবু আমি বারবার—বোধ হয় বহু শতবার এই ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। কখনও দাস হইয়া জন্মিয়াছি, কখনও সম্রাট্ হইয়া সসাগরা পৃথ্বী শাসন করিয়াছি; শত মহিষী, সহস্র বন্দিনী, আমার সেবা করিয়াছে। বিদ্যুৎশিখার মতো, জ্বলন্ত বহ্নির মতো রূপ লইয়া আজ সেই নারীকুল কোথায় গেল? সে রূপ পৃথিবীতে আর নাই—সে নারীজাতিও আর নাই, ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এখন যাহারা আছে, তাহারা তেলাপোকার মতো অন্ধকারে বাঁচিয়া আছে। তখন নারী ছিল অহির মতো তীব্র দুর্জেয়। আরণ্য অশ্বিনীর মতো তাহাদিগকে বশ করিতে হইত।

আর পুরুষ? আরশিতে নিজের মুখ দেখি আর হাসি পায়। সেই আমি—শূরসেনরাজের দুই কন্যাকে দুই বাহুতে লইয়া দুর্গ-প্রাচীর হইতে পরিখার জলে লাফাইয়া পড়িয়া সন্তরণে যমুনা পার হইয়াছিলাম। তার পর—কিন্তু যাক্ সে কথা। কেহ বিশ্বাস করিবে না, কেবল হাসিবে। আমিও হাসি—অফিসে কলম পিষিতে পিষিতে হঠাৎ অট্টহাসি হাসিয়া উঠি।

কিন্তু কথাটা সত্য। এমন বহুবার ঘটিয়াছে। রাজগীরের ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়াইয়া মনে হইয়াছিল, এ-স্থান আমার চির-পরিচিত; একবার নহে—শত সহস্রবার আমি এইখানে

দাঁড়াইয়াছি। কিন্তু তখন এ-স্থান জঙ্গল ও ইষ্টকস্তূপে সমাহিত ছিল না। ঠিক যেখানে আমি দাঁড়াইয়া আছি, তাহার বাঁ দিক্ দিয়া এক সংকীর্ণ দীর্ঘ পথ গিয়াছিল। পথের দুই পাশে ব্যবহারী-দের গৃহ ছিল; দূরে ঐ স্থানে মহাধনিক সুবর্ণদত্তের দারু-নির্মিত প্রাসাদ ছিল। যে দিন রাজগৃহে আগুন লাগে, সে দিন সুবর্ণদত্ত আসবপানে বিবশ হইয়া কক্ষদ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘুমাইতেছিল। তাহার সঙ্গে ছিল চারিজন রূপাজীবা নগরকামিনী। নগর ভস্মী-ভূত হইবার পর পৌরজন তাহাদের মৃতদেহ কক্ষ হইতে বাহির করিল। দেখা গেল, শ্রেষ্ঠী মরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার দেহ দগ্ধ হয় নাই—সুসিদ্ধ হইয়াছে মাত্র। কিছুকাল পূর্বে সে বলিদ্বীপ হইতে এক অষ্টোত্তর-সহস্রনাল ইন্দ্রচ্ছন্দা মালা আনিয়াছিল। সেরূপ মুক্তাহার মগধে আর ছিল না। সকলে দেখিল, বণিকের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আছে সেই ইন্দ্রচ্ছন্দার মুক্তাভস্ম।

কিন্তু ক্রমেই আমি অসংযত হইয়া পড়িতেছি। শূরসেনের সহিত মগধ, অগ্নিদাহের সহিত রাজকন্যা-হরণ মিশাইয়া ফেলি-তেছি। এমন করিলে তো চলিবে না।

আসল কথাটা আর একবার বলিয়া লই—আমি জাতিস্মর। মিউজিয়ামে রক্ষিত এক শিলাশিল্প দেখিয়া আমার বুকের ভিতরটা আলোড়িত হইয়া উঠে, কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া যায়। এ শিল্প তো আমার রচনা। আসমুদ্রকরগ্রাহী সম্রাট্ কণিষ্কের সময় যখন সদ্ধর্মের পুনরুত্থান হইয়াছিল, তখন বিহারের গাত্রশোভার জন্য এ নবপত্রিকা আমি গড়িয়াছিলাম। তখন আমার নাম ছিল পুণ্ডরীক। আমি ছিলাম প্রধান শিল্পী—রাজভাস্কর। সেই পুণ্ডরীক-জীবনের প্রত্যেক ঘটনা যে আমার স্মরণে মুদ্রিত আছে। এই যে নব-পত্রিকার মধ্যবর্তী বিনগ্না যক্ষিণী-মূর্তি দেখিতেছেন, তাহার আদর্শ

কে ছিল জানেন? সিতাংশুকা—তক্ষশিলার সর্বপ্রধানা রূপোপজীবিনী বারমুখ্যা। সকলেই জানিত, সিতাংশুকা রাজ-ঔরসজাতা। সেই সিতাংশুকাকে নিরংশুকা করিয়া, সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, বজ্রসূচী দিয়া পাষাণ কাটিয়া কাটিয়া এই যক্ষিণী-মূর্তি গড়িয়াছিলাম। পুণ্ডরীক ভিন্ন এ মূর্তি আর কে গড়িতে পারিত? কিন্তু তবু মনে হয়, সে অপার্থিব লাবণ্য কঠিন প্রস্তরে ফুটে নাই। আজও এই কেরানী জীবনেও সেই অলৌকিক রূপৈশ্বর্য আমার মস্তিষ্কের মধ্যে অঙ্কিত আছে।

আবার কেমন করিয়া বিষ-ধূম দিয়া সিতাংশুকা আমার প্রাণসংহার করিল, সে কথাও ভুলি নাই। সুরম্য কক্ষ, চতুষ্কোণে স্ফটিক-গোলকের মধ্যে পুন্নাগচম্পক-তৈলের সুগন্ধি দীপ জ্বলিতেছে, কেন্দ্রস্থলে বিচিত্র চীনাংশুকে আবৃত পালঙ্কশয্যা, শিয়রে ধূপ জ্বলিতেছে।—সেই ধূপশলাকার গন্ধে ধীরে ধীরে দেহ অবশ হইয়া আসিতেছে। বহুদূর হইতে বাদ্যের করুণ নিক্কণ ইন্দ্রিয়সকলকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করিয়া আনিতেছে; তার পর মোহনিদ্রা—সে নিদ্রা সে জন্মে আর ভাঙিল না।

এমনই কত জীবনের কত বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কত অসমাপ্ত কাহিনী স্মৃতির মধ্যে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। সেই সুদূর অতীতে এমন অনেক জিনিস ছিল—যাহা সেকালের সম্পূর্ণ নিজস্ব, একালের সহিত তাহার সম্বন্ধমাত্র নাই। অতিকায় হস্তীর মতো তাহারা সব লোপ পাইয়াছে। মনে হয় যেন, তখন মানুষ বেশী নিষ্ঠুর ছিল, জীবনের বড় একটা মূল্য ছিল না। অতি তুচ্ছ কারণে এক জন আর এক জনকে হত্যা করিত এবং সেই জন্যই বোধ করি, মানুষের প্রাণের ভয়ও কম ছিল। আবার মানুষের মধ্যে ক্রূরতা, চাতুরী, কুটিলতা ছিল বটে, কিন্তু ক্ষুদ্রতা ছিল না। একালের মানুষ যেন

সব দিক্ দিয়াই ছোট হইয়া গিয়াছে। দেহের, মনের, হৃদয়ধর্মের সে প্রসার আর নাই। যেন মানুষ তখন তরুণ ছিল, এখন বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে।

আর একটা কথা, একালের মতো স্বাধীনতা কথাটাকে তখন কেহ এত বড় করিয়া দেখিত না। মাছ যেমন জলে বাস করে, মানুষ তেমনই স্বাধীনতার আবহাওয়ায় বাস করিত। স্বাধীনতায় ব্যাঘাত পড়িলে লড়াই করিত, মরিত; বাঘের মতো পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াও পোষ মানিত না। যুগান্তরব্যাপী অধীনতার শৃঙ্খল তখনও মানুষের পায়ে কাটিয়া বসে নাই, মনের দাসবৃত্তি ছিল না। রাজা ও প্রজার মধ্যে প্রভেদও এত বেশী ছিল না। নির্ভয়ে দীন প্রজা চক্রবর্তী সম্রাটের নিকট আপনার নালিশ জানাইত, অধিকার দাবি করিত, ভয় করিত না।

ঘরের কোণে বসিয়া লিখিতেছি, আর ধূম-কুণ্ডলীর মতো বর্তমান জগৎ আমার সম্মুখ হইতে মিলাইয়া যাইতেছে। আর একটি মায়াময় জগৎ ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছে। আড়াই হাজার বৎসর পূর্বের এক স্বপ্ন দেখিতেছি। এক পুরুষ—ভারত আজ তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছে—তাঁহার কোটিচন্দ্রস্নিগ্ধ মুখপ্রভা এই দুই নশ্বর নয়নে দেখিতেছি, আর অন্তরের অন্তস্তল হইতে আপনি উৎসারিত হইতেছে—

“অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়—”

সেই জ্যোতির্ময় পুরুষকে এক দিন দুই চক্ষু ভরিয়া দেখিয়াছিলাম—তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়াছিলাম—আজ সেই কথা জন্মান্তরের স্মৃতি হইতে উদ্ধৃত করিব।

উত্তরে মাতুলবংশ লিচ্ছবি ও পশ্চিমে মাতুলবংশ কোশল মগধেশ্বর পরমবৈষ্ণব শ্রীমন্মহারাজ অজাতশত্রুকে বড়ই বিব্রত করিয়া তুলিয়াছে। পূর্বতন মহারাজ বিম্বিসার শান্তিপ্রিয় লোক ছিলেন, তাই লিচ্ছবি ও কোশলের সহিত বিবাদ না করিয়া তাহাদের কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু কিন্তু সে ধাতুর লোক নহেন—বিবাহ করা অপেক্ষা যুদ্ধ করাকে তিনি বেশী পছন্দ করেন। তা ছাড়া, ইচ্ছা থাকিলেও মাতুলবংশে বিবাহ করা সম্ভব নহে। তাই অজাতশত্রু পিতার অপঘাত মৃত্যুর পর প্রফুল্ল মনে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন।

কিন্তু অসুবিধা এই যে, শত্রু দুই দিকে,—উত্তরে এবং পশ্চিমে। উত্তরের শত্রু তাড়াইতে গেলে পশ্চিমের শত্রু রাজ্যের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে; কোশলকে কাশীর পরপারে খেদাইয়া দিয়া ফিরিবার পথে দেখেন, লিচ্ছবিরা রাজগৃহে ঢুকিবার বন্দোবস্ত করিতেছে। মগধ-রাজ্যের অন্তপাল সামন্ত রাজারা সীমানা রক্ষা করিতে না পারিয়া, কেহ রাজধানীতে পলাইয়া আসিতেছে, কেহ বা শত্রুর সহিত মিলিয়া যাইতেছে। রাজ্যে অশান্তির শেষ নাই। প্রজারা কেহই অজাতশত্রুর উপর সন্তুষ্ট নহে; তাহাদের মতে রাজা বীর বটে, কিন্তু বুদ্ধিশুদ্ধি অধিক নাই, শীঘ্র ইহাকে সিংহাসন হইতে না সরাইলে রাজ্য ছারেখারে যাইবে।

প্রজারা কিন্তু ভুল বুঝিয়াছিল। অজাতশত্রু নির্বোধ মোটেই ছিলেন না। তাঁহার অসির এবং বুদ্ধির ধার প্রায় সমান তীক্ষ্ণ ছিল।

একদিন, বর্ষাকালের আরম্ভে যুদ্ধ স্থগিত আছে—অজাতশত্রু রাজ্যের মহামাত্য বর্ষকারকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। নগরের নির্জন স্থানে বেণুবন নামে এক উদ্যান আছে; বিম্বিসার ইহা বুদ্ধদেবকে দান করিয়াছিলেন, কিন্তু অজাতশত্রু আবার উহা কাড়িয়া

লন। সেই উদ্যানে প্রাচীন মন্ত্রী ও নবীন মহারাজের মধ্যে অতি গোপনে কি কথাবার্তা হইল। সে সময় গুপ্তচরের ভয় বড় বেশী; সন্ন্যাসী, ভিক্ষুক, জ্যোতিষী, বারবনিতা, নট, কুশীলব, ইহাদের মধ্যে কে গুপ্তচর কে নহে, অনুমান করা অতিশয় কঠিন। সম্প্রতি নগরে বৈশালী হইতে জঘনচপলা নাম্নী এক বারাঙ্গনা আসিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সমস্ত নাগরিক তো ভুলিয়াছেই, এমন কি স্বয়ং রাজা পর্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু জঘনচপলা কোশল কিংবা বৃজির গুপ্তচর কি না, নিশ্চিতরূপে না-জানা পর্যন্ত অজাতশত্রু নিজেকে কঠিন শাসনে রাখিয়াছেন। এইরূপ চর সর্বত্রই ঘুরিতেছে; তাই গূঢ়তম মন্ত্রণা খুব সাবধান হইয়াই করিতে হয়। এমন কি, সকল সময় অন্যান্য অমাত্যদের পর্যন্ত সকল কথা জানানো হয় না।

নিভৃতে বহুক্ষণ আলাপের পর মহামন্ত্রী গৃহে ফিরিয়া গেলেন। উদ্যানের প্রতিহারী দেখিল, বৃদ্ধের শুষ্ক নীরস মুখে হাসি এবং নির্বাপিত চক্ষুতে জ্যোতি ফুটিয়াছে।

প্রহর রাত্রি অতীত হইবার পর আহারান্তে শয়ন করিয়াছিলাম, ঈষৎ নিদ্রাকর্ষণও হইয়াছিল। এমন সময় দাসী আসিয়া সংবাদ দিল, "পরিব্রাজিকা সাক্ষাৎ চান।"

তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। চকিতে শয্যায় উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "পরিব্রাজিকা? এত রাত্রে?"

এই রাজ-সম্মানিতা মহাশক্তিশালিনী নারী কি প্রয়োজনে এরূপ সময়ে আমার সাক্ষাৎপ্রার্থিনী, জানিবার জন্য ত্বরিতপদে দ্বারে উপস্থিত হইলাম। সসম্ভ্রমে তাঁহাকে গৃহের ভিতর আনিয়া আসনে বসাইয়া দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলাম, "দেবী, কি জন্য দাসের প্রতি কৃপা হইয়াছে?"

পরিব্রাজিকার যৌবন উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু মুখশ্রী এখনও সুন্দর ও সম্ভ্রম-উৎপাদক। তাঁহার পরিধানে পট্টবস্ত্র, ললাটে কুঙ্কুম-তিলক, হস্তে একটি সনাল পদ্মকোরক। সহাস্যে বলিলেন, "বৎস, অদ্য সন্ধ্যার পর কমলকোরক দিয়া কুমারীর পূজা করিতেছিলাম, সহসা এই কোরকটি কুমারীর চরণ হইতে আমার ক্রোড়ে পতিত হইল।"

কথার উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আমি শুধু বলিলাম, "তার পর ?"

পরিব্রাজিকা বলিলেন, "কুমারীর আদেশ বুঝিতে না পারিয়া ধ্যানস্থ হইলাম। তখন দেবী আমার কর্ণে বলিলেন, 'এই নির্মাল্য শ্রেণিনায়ক কুমারদত্তকে দিবে। ইহার বলে সে সর্বত্র গতিলাভ করিবে'।"

আমি হতবুদ্ধির মতো পরিব্রাজিকার মুখের পানে তাকাইয়া রহিলাম।

তিনি কক্ষের চতুর্দিকে ক্ষিপ্র দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিলেন, "এই কোরক লও, ইহাতেই উপদেশ আছে। কার্যসিদ্ধি হইলে ইহার বিনাশ করিও। মনে রাখিও, ইহার বলে রাজমন্দিরেও তোমার গতি অব্যাহত হইবে।"

এই বলিয়া পদ্মকলিটি আমার হস্তে দিয়া পরিব্রাজিকা বিদায় লইলেন। আমি নির্বোধের মতো বসিয়া রহিলাম, তাঁহাকে প্রণাম করিতেও ভুলিয়া গেলাম।

আমি সামান্য ব্যক্তি—কুলী-মজুর খাটাইয়া খাই, রাজগৃহের স্থপতি-সূত্রধার-সম্প্রদায়ের শ্রেণিনায়ক। আমার উপর রাজ-রাজড়ার দৃষ্টি পড়িল কেন ? যদি বা পড়িল, তবে এমন রহস্যময় ভাবে পড়িল কেন ? রাজ-অবরোধের পরিব্রাজিকা আমার মতো

দীনের কুটীরে পদধূলি দিলেন কি জন্য? কুমারী কুমারদত্তের উপর সদয় হইয়া তাহার সর্বত্র গতিবিধির ব্যবস্থাই বা করিয়া দিলেন কেন? এখন এই পদ্মকলি লইয়া কি করিব? কার্যসিদ্ধি হইলে ইহাকে বিনষ্ট করিতেই বা হইবে কেন? আমি পূর্বে কখনও রাজকীয় ব্যাপারে লিপ্ত হই নাই, তাই নানা চিন্তায় মন একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল।

দ্বিপ্রহর রাত্রি প্রায় উত্তীর্ণ হইতে চলিল। দাসী দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে। তাহার বোধ করি, আজ কোথাও অভিসার আছে, কারণ বেশ-ভূষায় একটু শিল্প-চাতুর্য রহিয়াছে। কবরীতে জাতিপুষ্পের শোভা, কঞ্চুলী দৃঢবদ্ধ। দাসী দেখিতে মন্দ নহে, চোখ দুটি বড় বড়, মুখে মিষ্ট হাসি, তার উপর ভরা যৌবন। আমি তাহাকে বলিলাম, "বনলতিকে, তুমি গৃহে যাও, রাত্রি অধিক হইয়াছে।" সে হাসিমুখে প্রণাম করিয়া বিদায় হইল।

পদ্মকোরক হস্তে শয়ন-মন্দিরে গেলাম; বর্তিকার সম্মুখে ধরিয়া বহুক্ষণ নিরীক্ষণ করিলাম। কোরকটি মুদিত হইয়া আছে, ধীরে ধীরে পলাশগুলি উন্মোচন করিয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে নাভির সমীপবর্তী কোমল পল্লবে অস্পষ্ট চিহ্নসকল চোখে পড়িল। সযত্নে পল্লবটি ছিঁড়িয়া দেখিলাম, কজ্জলমসী দিয়া লিখিত লিপি—'অদ্য মধ্যরাত্রে একাকী মহামন্ত্রীর দ্বারে উপস্থিত হইবে। সংকেত-মন্ত্র—কুট্মল।' লিপির নিম্নে মগধেশ্বরের মুদ্রা।

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হইল। পরিব্রাজিকার নিগূঢ় কথাবার্তা, কুমারীর পূজা সমস্তই স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম। গোপনে মহামাত্যের নিকট আমার তলব হইয়াছে। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে ডাকিয়া পাঠাইলেই তো হইত! আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। আমি একজন অতি সামান্য নাগরিক,

আমাকে লইয়া রাজ্যের মহামাত্য কি করিবেন? বুড়া অত্যন্ত খিট্‌খিটে, কি জানি যদি না-জানিয়া কোনও অপরাধ করিয়া থাকি তবে হয়তো শূলে চড়াইয়া দিবে। কিংবা কে বলিতে পারে, হয়তো গোপনে কোথাও রত্নাগার নির্মাণ করিতে হইবে, তাই এই সতর্ক আহ্বান।

উদ্বেগ, আশঙ্কা এবং উত্তেজনায় আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। কিন্তু রাজাদেশ উপেক্ষা করিবার উপায় নাই,—স্বেচ্ছায় না যাইলে হয়তো বাঁধিয়া লইয়া যাইবে। তাই অবশেষে একটি উত্তরীয় লইয়া পথে বাহির হইলাম।

আমার গৃহ নগরের উত্তরে, মহামন্ত্রীর প্রাসাদ নগরের কেন্দ্র-স্থলে। পথ জনহীন, পথের উভয় পার্শ্বস্থ গৃহগুলিও নির্বাপিতদীপ, নিদ্রিত। দূরে দূরে সংকীর্ণ পথিপার্শ্বে পাষাণ-বনদেবীর হস্তে স্ফটিকের দীপ জ্বলিতেছে। তাহাতে মধ্যরাত্রের গাঢ় অন্ধকার ঈষৎ আলোকিত।

মহামাত্যের বৃহৎ প্রাসাদ-সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। বাহিরে অন্ধকার, প্রহরীও নাই; কিন্তু বহির্দ্বার উন্মুক্ত। একটু ইতস্ততঃ করিয়া, সাহসে ভর করিয়া প্রবেশ করিতে গেলাম—অমনি তীক্ষ্ণ ভল্লের অগ্রভাব কণ্ঠে ফুটিল; অন্ধকারে অদৃশ্য থাকিয়া ভল্লের অন্য-প্রান্ত হইতে কে-নিম্নস্বরে প্রশ্ন করিল, "তুমি কে?"

অকস্মাৎ এরূপভাবে আক্রান্ত হইয়া বাক্‌রোধ হইয়া গেল। বর্শার ফলা কণ্ঠ স্পর্শ করিয়া আছে, একটু চাপ দিলেই সর্বনাশ! আমি মূর্তির মতো ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া শেষে সেই সনাল পদ্মকলি তুলিয়া ধরিয়া দেখাইলাম।

আততায়ী জিজ্ঞাসা করিল, "উহা কি, নাম বল।"

বলিলাম, "সনাল উৎপল।"

সন্দিগ্ধকণ্ঠে পুনরায় প্রশ্ন হইল, "কি নাম বলিলে ?"

বুঝিলাম, এ প্রহরী। লিপিতে যে সংকেত-মন্ত্র ছিল তাহা স্মরণ হইল, বলিলাম, "কুট্‌মল।"

বর্শা কণ্ঠ হইতে অপসৃত হইল। অন্ধকারে প্রহরী আমার হাত ধরিয়া প্রাসাদের মধ্যে লইয়া চলিল।

সূচীভেদ্য অন্ধকারে কিছুদূর পর্যন্ত সে আমাকে লইয়া গেল। তারপর আর একজন আসিয়া হাত ধরিল। সে আরও কিছুদূর লইয়া গিয়া অন্য এক হস্তে সমর্পণ করিল। এইরূপে পাঁচ ছয় জন দ্বারী, প্রহরী, প্রতিহারীর হস্ত হইতে হস্তান্তরিত হইয়া অবশেষে এক আলোকিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে উপস্থিত হইলাম।

সেই কক্ষের মধ্যস্থলে অজিনাসনে বসিয়া একস্তূপ ভূর্জপত্র-তালপত্র সম্মুখে লইয়া বৃদ্ধ মহামন্ত্রী নিবিষ্ট-মনে পাঠ করিতেছেন। কক্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।

সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলাম। মহামাত্য সম্মুখে আসন নির্দেশ করিয়া বলিলেন, "উপবিষ্ট হও।"

আমি উপবেশন করিলাম।

মহামাত্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "পরিব্রাজিকার হস্তে যে লিপি পাইয়াছিলে, উহা কোথায় ?"

পদ্মদল বাহির করিয়া মহামাত্যকে দিলাম। তিনি সেটার উপর একবার চক্ষু বুলাইয়া আমাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "ভক্ষণ কর।"

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার মুখের প্রতি মূঢ়বৎ তাকাইয়া রহিলাম। ভক্ষণ করিব আবার কি ?

মহামন্ত্রী আবার বলিলেন, "এই লিপি ভক্ষণ কর।"

মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। রাত্রি দ্বিপ্রহরে ডাকাইয়া পাঠাইয়া

তার পর অকারণে লিপি ভক্ষণ করিতে বলা, এ কিরূপ ব্যবহার? হউন না তিনি রাজমন্ত্রী—তাই বলিয়া—

মন্ত্রীর ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ কুঞ্চন দেখা গেল। আবার অনুচ্চ কণ্ঠে কহিলেন, "চারিদিকে গুপ্তচর ঘুরিতেছে—তাই এ সতর্কতা। লিপি সুস্বাদু বলিয়া তোমাকে উহা খাইতে বলি নাই।"

তখন ব্যাপার বুঝিয়া সেই কোমল পদ্মপল্লবটি খাইয়া ফেলিলাম।

তারপর কিছুক্ষণ সমস্ত নীরব। মহামাত্যের শীর্ণ মুখ ভাবলেশ-হীন। প্রদীপের শিখা নিষ্কম্পভাবে জ্বলিতেছে। আমি উদ্‌গ্রীব প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি, এবার কি হইবে?

হঠাৎ প্রশ্ন হইল, "তুমি জঘনচপলার গৃহে গতায়াত কর?"

অতর্কিত প্রশ্নে ক্ষণকালের জন্য বিমূঢ় হইয়া গেলাম। জঘন-চপলা বেশ্যা, তাহার গৃহে যাই কি না সে সংবাদে রাজমন্ত্রীর কি প্রয়োজন? কিন্তু অস্বীকার করিবার উপায় নাই, বুড়া খোঁজ না লইয়া জিজ্ঞাসা করিবার পাত্র নহে। কুণ্ঠিতস্বরে কহিলাম, "একবার মাত্র গিয়াছিলাম। কিন্তু সে স্থান আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির নয়। তাই আর যাই নাই।"

মন্ত্রী বলিলেন, "ভালো করিয়াছ। সে লিচ্ছবির গুপ্তচব।"

আবার কিছুক্ষণ সমস্ত নিস্তব্ধ। মহামাত্য ধ্যানমগ্নের মতো বসিয়া আছেন; আমি আর একটি প্রশ্নের বজ্রাঘাত প্রতীক্ষা করিতেছি।

"তোমার অধীনে কত কর্মিক আছে?"

"সর্বসুদ্ধ প্রায় দশ সহস্র।"

"স্থপতি কত?"

"ছয় হাজার।"

"সূত্রধার ?"

"তিন হাজারের কিছু উপর।"

"তক্ষক ও ভাস্কর ?"

"তক্ষক-ভাস্করের সংখ্যা কম—পাঁচশতের অধিক নহে।"

দেখিতে দেখিতে মহামন্ত্রীর নির্জীব শুষ্ক দেহ যেন মন্ত্রবলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। নিষ্প্রভ চক্ষুতে যৌবনের জ্যোতি সঞ্চারিত হইল। তিনি আমার দিকে তর্জনী তুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "শুন। এখন বর্ষাকাল। শরৎকাল আসিলে পথঘাট শুকাইলে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। দুই দিক্ হইতে শত্রুর আক্রমণে দেশ বিধ্বস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অতএব এবার যুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে ভাগীরথী ও হিরণ্যবাহুর সংগমে এক ঔদক দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে। এমন দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে—যাহাতে পঞ্চাশ হাজার যোদ্ধা নিত্য বাস করিতে পারে। মধ্যে মাত্র তিন মাস সময়। এই তিন মাসের মধ্যে দুর্গ সম্পূর্ণ হওয়া চাই। এবার শরৎকালে কোশল ও বৃজি যখন নদী পার হইতে আসিবে, তখন সম্মুখে যেন মগধের গগনলেহী দুর্গচূড়া দেখিতে পায়।"

জলের মৎস্য ধীবরের জাল হইতে জলে ফিরিয়া আসিলে যেরূপ আনন্দিত হয়, আমারও সেইরূপ আনন্দ হইল। এই সকল কথা আমি বুঝি। বলিলাম, "দশ হাজার লোক দিয়া তিন মাসের মধ্যে এরূপ দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিতে পারি। কিন্তু এই বর্ষাকালে পথ অতিশয় দুর্গম; মালমসলা সংগ্রহ হইবে না।"

মন্ত্রী বলিলেন, "সে ভার তোমার নয়। তুমি শুধু দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিবে। উপাদান সংগ্রহ আমি করিব। রাজ্যের সমস্ত রণহস্তী পাষাণাদি বহন করিয়া দিবে। সেজন্য তোমার চিন্তা নাই।"

আমি বলিলাম, "তবে তিন মাসের মধ্যে দুর্গ তৈয়ার করিয়া দিব।"

মন্ত্রী বলিলেন, "যদি না পার ?"

"আমার মুণ্ড শর্ত রহিল। কবে কার্য আরম্ভ করিব ?"

মন্ত্রী ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিলেন, "এখনও রবি স্থিররাশিতে আছেন ; আজ হইতে চতুর্থ দিবসে গুরুবাসরে চন্দ্রও স্বাতীনক্ষত্রে গমন করিবেন। অতএব সেই দিনই কার্যের পত্তন হওয়া চাই "

"যথা আজ্ঞা, তাহাই হইবে।"

কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া মহামাত্য বলিতে লাগিলেন, "এখন যাহা বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শুন। তোমার উপর অত্যন্ত গূঢ় কার্যের ভার অর্পিত হইতেছে। সর্বদা স্মরণ রাখিও যে শত্রু-রাজ্যে দুর্গনির্মাণের সংবাদ পৌঁছিলে তাহারা কিছুতেই দুর্গ নির্মাণ করিতে দিবে না, পদে পদে বাধা দিবে। চারিদিকে গুপ্তচর ঘুরিতেছে, তাহারা যদি একবার মগধের উদ্দেশ্য জানিতে পারে, সপ্তাহকালমধ্যে কোশলের মহারাজ ও লিচ্ছবির কুলপতিগণ এ সংবাদ বিদিত হইবে। সুতরাং নিরতিশয় সতর্কতার প্রয়োজন। তুমি তোমার দশ সহস্র কর্মিক লইয়া কাল গঙ্গা-শোণ সংগমে যাত্রা করিবে। এমন ভাবে যাত্রা করিবে—যাহাতে কাহারও সন্দেহ উদ্রিক্ত না হয়। একবার যথাস্থানে পৌঁছিতে পারিলে আর কোনও ভয় নাই। কারণ, সে স্থান জঙ্গলপূর্ণ, প্রায় জনহীন। কিন্তু তৎপূর্বে পথে যদি কোনও ব্যক্তিকে গুপ্তচর বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে হত্যা করিতে দ্বিধা করিবে না। কার্যস্থলে উপস্থিত হইয়া মগধের মুদ্রাঙ্কিত পত্রের প্রতীক্ষা করিবে। সেই পত্রে দুর্গনির্মাণের নির্দেশ ও চিত্র লিপিবদ্ধ থাকিবে। যথাসময়ে চিত্রানুরূপ দুর্গের শুভারম্ভ করিবে। স্মরণ

রাখিও, তুমি এ কার্যের নিয়ামক, কোনও বিঘ্ন ঘটিলে দায়িত্ব সম্পূর্ণ তোমার।”

আমি বলিলাম, “যথা আজ্ঞা। কিন্তু এই দশ সহস্র লোকের রসদ কোথায় পাইব?”

মন্ত্রী বলিলেন, “গঙ্গা-শোণ-সংগমের নিকট পাটলি নামে এক ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। এক সন্ধ্যার জন্য সেই গ্রামে আতিথ্য স্বীকার করিবে। দ্বিতীয় দিনে আমি তোমাদের উপযুক্ত আহার্য পাঠাইব।”

তারপর উষাকাল সমাগত দেখিয়া মহামাত্য আমাকে বিদায় দিলেন। বিদায়কালে বলিলেন, “শুনিয়া থাকিবে, সম্প্রতি বৌদ্ধ নামে এক নাস্তিক ধর্মসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে। এই বৌদ্ধগণ অতি চতুর ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বিরোধী। শাক্যবংশের এক রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ ইহাদের নায়ক। এই যুবরাজ অতিশয় ধূর্ত, কপটী ও পরস্বলুব্ধ। মায়াজাল বিস্তার করিয়া গতাসু মগধেশ্বর বিম্বিসারকে বশীভূত করিয়া মগধে স্বীয় প্রভাব-প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়াছিল; অধুনা অজাতশত্রু কর্তৃক মগধ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে। এই বৌদ্ধদিগকে কদাচ বিশ্বাস করিবে না, ইহারা মগধের ঘোর শত্রু। দুর্গসন্নিধানে যদি ইহাদের দেখিতে পাও, নির্দয়ভাবে হত্যা করিও।”

* * * *

তাই ভাবি, কালের কি কুটিল গতি! আড়াই হাজার বৎসর পরে আজ পাটলিপুত্র-বচয়িতা মগধের পরাক্রান্ত মহামন্ত্রী বর্ষ-কারের নাম কেহ শুনিয়াছে কি? কিন্তু শাক্যবংশের সেই রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ? আজ অর্ধেক এশিয়া তাঁহার নাম জপ করিতেছে। সসাগরা পৃথ্বীকে যাহারা বারবনিতার ন্যায় উপভোগ করিয়াছিল, তাহাদের নাম সেই ভুক্তিতা ধরিত্রীর ধূলিকণার সহিত মিশাইয়া গিয়াছে; আর যে নিঃসম্বল রাজ-ভিখারীর একমাত্র সম্পদ্ ছিল

নির্বাণ, সেই শাক্যসিংহের নাম অনির্বাণ শিখার ন্যায় তমসান্ধ মানবকে জ্যোতির পথ নির্দেশ করিতেছে।

বর্ষাকালে স্থপতি-সূত্রধার-সম্প্রদায় প্রায়শ বসিয়া থাকে। তাই আমার শ্রেণীভুক্ত শ্রমিকদিগকে সংগ্রহ করিতে বড় বিলম্ব হইল না। যথাসময় আমার দশ হাজার শিল্পী নগরের ভিন্ন ভিন্ন তোরণ দিয়া বাহির হইয়া গেল। কোনও পথে দুই শত, কোনও পথে চারি শত বাহির হইল—যাহাতে নাগরিক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে। বেলা প্রায় তিন প্রহরকালে নগরের উত্তরে তিন ক্রোশ দূরে সকলে সমবেত হইল।

এখান হইতে গঙ্গা-শোণ-সংগম প্রায় পঞ্চদশ ক্রোশ, ন্যূনাধিক এক দিনের পথ। পরামর্শের পর স্থির হইল যে, সন্ধ্যা পর্যন্ত যতদূর সম্ভব যাইব, তাবপব পথিপার্শ্বে রাত্রি কাটাইয়া পরাহে অতিপ্রত্যূষে আবার গন্তব্যস্থানের উদ্দেশে যাত্রা কবিব। তাহা হইলে মধ্যাহ্নের পূর্বে পাটলিগ্রামে পৌঁছিতে পারা যাইবে।

তখন সকলে যুদ্ধগামী পদাতিক সৈন্যের মতো শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিতে আরম্ভ করিল। আকাশে প্রবল মেঘাড়ম্বর, শীতল বায়ু খরভাবে বহিতেছে; রাত্রিতে নিশ্চয় বৃষ্টি হইবে। কিন্তু সে জন্য কাহারও উদ্বেগ নাই। আসন্ন কর্মের উল্লাসে সকলে মহানন্দে গান গাহিতে গাহিতে চলিল।

মগধরাজ্যের স্থানীয় বলিয়া তখন রাজগৃহ হইতে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম চতুর্দিকে বিভিন্ন রাজ্যে যাইবার পথ ছিল। তদ্‌ভিন্ন নগর হইতে নগরান্তরে যাইবার পথও ছিল। রাজকোষ হইতে পথের জন্য প্রভূত অর্থ-ব্যয় করা হইত। আবশ্যক হিসাবে পথের উপর প্রস্তরখণ্ড বিছাইয়া পথ পাকা করা হইত, পথিকের সুবিধার

জন্য পথের ধারে কূপ খনন করানো হইত, ছায়া করিবার জন্য দুই ধারে বট, অশ্বত্থ, শাল্মলী বৃক্ষ রোপিত হইত। মধ্যে নদী পড়িলে সেতু বা খেয়ার বন্দোবস্ত থাকিত।

এই সকল পথে দলবদ্ধ বৈদেশিক বণিক্‌গণ অশ্ব, গর্দভ ও উষ্ট্রপৃষ্ঠে মহার্ঘ পণ্যভার বহন করিয়া নগরে নগরে ক্রয়-বিক্রয় করিয়া বেড়াইত ; নট-কুশীলব সম্প্রদায় আপন আপন কলা-নৈপুণ্য দেখাইয়া ফিরিত। রাজদূত দ্রুতগামী অশ্বে চড়িয়া বায়ুবেগে গোপন-বার্তা বহন করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইত। কদাচ রাত্রিকালে এই সকল পথে দস্যু-তস্করের ভয়ও শুনা যাইত। বন্য আটবিক জাতিরা এইরূপ উৎপাত করিত। কিন্তু তাহা কচিৎ, কালেভদ্রে। পথের পাশে সৈনিকের গুল্ম থাকায় তস্করগণ অধিক অত্যাচার করিতে সাহসী হইত না। রাজপথ যথাসম্ভব নিরাপদ ছিল।

উত্তরে ভাগীরথীতীর পর্যন্ত মগধের সীমা—সেই পর্যন্ত পথ গিয়াছে। আমরা সেই পথ ধরিয়া চলিলাম। ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া আসিল, বায়ু স্তব্ধ এবং আকাশে মেঘপুঞ্জ বর্ষণোন্মুখ হইয়া রহিল। আমরা রাত্রির মতো পথসন্নিকটে এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে আশ্রয় লইলাম।

প্রত্যেকের সহিত এক সন্ধ্যার আহার্য ছিল। কিন্তু বর্ষাকালে উন্মুক্ত প্রান্তরে রন্ধনের সুবিধা নাই। কষ্টে যদি বা অগ্নি জ্বালা যায়, বৃষ্টি পড়িলেই নিবিয়া যাইবার সম্ভাবনা। তথাপি অনেকে একটা মৃত বৃক্ষ হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া যব-গোধূমচূর্ণ ও শক্তু শানিয়া পিষ্টক-পুরোডাশ্‌ তৈয়ার করিতে লাগিল। আবার যাহারা অতটা পরিশ্রম স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তাহারা চিপিটক জলে সিক্ত করিয়া দধি-শর্করা সহযোগে ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল।

চারিদিক হইতে দশ হাজার লোকের কলরব, গুঞ্জন, গান, চিৎকার, গালিগালাজ আসিতেছে। দূরে দূরে ধুনির ন্যায় অগ্নি জ্বলিতেছে। অন্ধকারে তাহারই আশেপাশে মানুষের ছায়ামূর্তি ঘুরিতেছে। ক্বচিৎ অগ্নিতে তৈল বা ঘৃত প্রদানের ফলে অগ্নি অত্যুজ্জ্বল শিখা তুলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। সেই আলোকে চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট মানুষের মুখ ক্ষণকালের জন্য স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। এ যেন সহসা বিজন প্রান্তর মধ্যে এক ভৌতিক উৎসব আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

আমার সহিত কদলী, কপিত্থ, রসাল ইত্যাদি ফল, কিঞ্চিৎ মৃগমাংস এবং এক দ্রোণ লোধ্ররেণু চিত্রকাদির দ্বারা সুরভিত হিঙ্গুল-রঞ্জিত অতি উৎকৃষ্ট আসব ছিল। আমি তদ্দারা আমার নৈশ আহার সুসম্পন্ন করিলাম।

ক্রমে রাত্রি গভীর হইতে চলিল। এক বৃহৎ বৃক্ষতলে মৃত্তিকার উপর আস্তরণ পাতিয়া আমি শয়নের উপক্রম করিতেছি, এমন সময় অন্ধকারে দুই জন লোক আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে ?"

এক জন উত্তর দিল, "নায়ক, আমি এই ছাউনির রক্ষী। অপরিচিত এক ব্যক্তি কূপের নিকট বসিয়াছিল, তাই আদেশমত ধরিয়া আনিয়াছি।"

আমি বলিলাম, "মশাল জ্বাল।"

মশাল জ্বলিলে দেখিলাম, প্রহরীর সঙ্গে এক দীর্ঘাকৃতি নগ্নপ্রায় অতিশয় শ্মশ্রুগুম্ফজটাবহুল পুরুষ। শুকচঞ্চুর ন্যায় বক্র নাসা, চক্ষু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কূপ-সন্নিকটে কি করিতেছিলে ?"

সে ব্যক্তি স্থির-নেত্রে আমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া

বলিল, "তুমি রাষ্ট্রপতি হইবে; তোমার ললাটে রাজদণ্ড দেখিতেছি।"

কৈতববাদে ভুলিবার বয়স আমার নাই। উপরন্তু মহামাত্য যে সন্দেহ আমার মনের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছিলেন, এই অপরিচিত জটিল সন্ন্যাসীকে দেখিবামাত্র তাহা জাগরূক হইয়া উঠিল। বলিলাম, "আপনি দেখিতেছি জ্যোতির্বিদ। আসন পরিগ্রহ করুন।"

আসনগ্রহণ করিয়া জটাধারী কহিলেন, "আমি শৈব সন্ন্যাসী। রুদ্রের কৃপায় আমার তৃতীয় নয়ন উন্মীলিত হইয়াছে। ত্রিকাল আমার নখ-দর্পণে প্রকট হয়। আমি দেখিতেছি, তুমি অদূর-ভবিষ্যতে মহালোকপালরূপে রাজদণ্ড ধারণ করিবে। তোমার যশোদীপ্তিতে ভূতপূর্ব রাজন্যগণের কীর্তিপ্রভা ম্লান হইয়া যাইবে।"

সন্ন্যাসীকে বুঝিয়া লইলাম। অত্যন্ত শ্রদ্ধাপ্লুতকণ্ঠে কহিলাম, "আপনি মহাজ্ঞানী। আমি অতি দুষ্কর কার্যে যাইতেছি; কার্যে সফল হইব কি না, আজ্ঞা করুন।"

ত্রিকালদর্শী ভ্রূকুটি করিয়া কিছুক্ষণ নিমীলিতনেত্রে রহিলেন, তার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাইতেছ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "আপনিই বলুন!"

সন্ন্যাসী তখন মৃত্তিকার উপর এক খণ্ড প্রস্তর দিয়া রাশিচক্র আঁকিলেন। আমি মৃদু হাস্যে প্রশ্ন করিলাম, "এ কি, আপনার নখ-দর্পণ কোথায় গেল?"

সন্ন্যাসী আমার প্রতি সন্দেহপ্রখর এক দৃষ্টি হানিয়া কহিলেন, "সূক্ষ্ম গণনা নখ-দর্পণে হয় না। তুমি জ্যোতিষশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, এ সকল বুঝিবে না।"

আমি বিনীতভাবে নীরব রহিলাম। সন্ন্যাসী গভীর মনঃ-সংযোগে রাশিচক্রে আঁক কষিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ অঙ্ক-পাত করিবার পর মুখ তুলিয়া কহিলেন, "তুমি কোনও গুপ্ত রাজ-কার্যে পররাজ্যে যাইতেছ। শনি ও মঙ্গল দৃষ্টি-বিনিময় করিতেছে, এজন্য মনে হয় তুমি যুদ্ধ-সংক্রান্ত কোনও গূঢ় কার্যে ব্যাপৃত আছ।" এই বলিয়া সপ্রশ্ননেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

আমি চমৎকৃত হইয়া বলিলাম, "আপনি সত্যই ভবিষ্যদ্দর্শী, আপনার অগোচর কিছুই নাই। আমি রাজানুজ্ঞায় লিচ্ছবি দেশে যাইতেছি, কি উদ্দেশ্যে যাইতেছি তাহা অবশ্যই আপনার ন্যায় জ্ঞানীর অবিদিত নাই। এখন কৃপা করিয়া আমার এক সুহৃদের ভাগ্যগণনা করিয়া দিতে হইবে। প্রহরী, কুলিক মিহিরমিত্র জম্বু-বৃক্ষতলে আশ্রয় লইয়াছেন, তাঁহাকে ডাক।"

কুলিক মিহিরমিত্র আমার অধীনে প্রধান শিল্পী এবং আমার প্রাণোপম বন্ধু। ভাস্কর্যে তাহার যেরূপ অধিকার জ্যোতিষশাস্ত্রেও সেইরূপ পারদর্শিতা। ভৃগু, পরাশর, জৈমিনি তাহার কণ্ঠাগ্রে।

মিহিরমিত্র আসিয়া উপবিষ্ট হইলে, আমি সন্ন্যাসীকে নির্দেশ করিয়া কহিলাম, "ইনি জ্যোতিষশাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, তোমার ভাগ্য গণনা করিবেন।"

মিহিরমিত্র সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া বসিল। তাহার আপাদ-মস্তক একবার নিরীক্ষণ করিয়া নিজ করতল প্রসারিত করিয়া বলিল, "কোন্ লগ্নে আমার জন্ম?"

সন্ন্যাসীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ঈষৎ চাঞ্চল্য ও উৎকণ্ঠার লক্ষণ দেখা দিল। সে করতলের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়াই বলিল, "তোমার অকালমৃত্যু ঘটিবে।"

মিহিরমিত্র বলিল, "ঘটুক, কোন্ লগ্নে আমার জন্ম?"

সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "বৃষ লগ্নে।"

"বৃষ লগ্নে!" মিহিরমিত্র হাসিল, "উত্তম। চন্দ্র কোথায়?"

"তুলা রাশিতে।"

"তুলা রাশিতে? ভালো। কোন্ নক্ষত্রে?"

সন্ন্যাসী নীরব। ব্যাকুলনেত্রে একবার চারিদিকে নিরীক্ষণ করিল, কিন্তু পলায়নের পথ নাই। জ্যোতিষীর নাম শুনিয়া উৎসুক কর্মিগণ একে একে আসিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে।

মিহিরমিত্র কঠোর-কণ্ঠে আবার প্রশ্ন করিল, "চন্দ্র কোন্ নক্ষত্রে?"

জিহ্বা দ্বারা শুষ্ক ওষ্ঠাধর লেহন করিয়া স্খলিতকণ্ঠে সন্ন্যাসী কহিল, "চন্দ্র মৃগশিরা নক্ষত্রে।"

মিহিরমিত্র আমার দিকে ফিরিয়া অল্প হাস্য করিয়া বলিল, "এ ব্যক্তি শঠ। জ্যোতিষশাস্ত্রের কিছুই জানে না।"

তখন সন্ন্যাসী দ্রুত উঠিয়া সেই শ্রমিক-ব্যূহ ভেদ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিল। সন্ন্যাসী অসাধারণ বলিষ্ঠ—কিন্তু বিশ জনের বিরুদ্ধে একা কি করিবে? অল্পকালের মধ্যেই সকলে ধরিয়া তাহাকে ভূমিতে নিপাতিত করিল। রজ্জু দ্বারা তাহার হস্তপদ বাঁধিয়া ফেলিবার পর সন্ন্যাসী বলিল, "মহাশয়, আমাকে বৃথা বন্ধন করিতেছেন। আমি দীন ভিক্ষুক মাত্র, জ্যোতিষীর ভান করিয়া কিছু বেশী উপার্জনের চেষ্টা করিয়াছিলাম; কিন্তু আপনারা জ্ঞানী—আমার কপটতা ধরিয়া ফেলিয়াছেন। এখন দয়া করিয়া আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমার যথেষ্ট দণ্ডভোগ হইয়াছে।"

আমি বলিলাম, "ভণ্ড সন্ন্যাসী, তুমি কোশল অথবা বৃজির গুপ্তচর। আমাকে ভুলাইয়া কথা বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছিলে।"

সন্ন্যাসী ভয়ে চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "কুমারীর শপথ, জয়ন্তের শপথ, আমি গুপ্তচর নহি। আমি ভিক্ষুক। আমাকে ছাড়িয়া দিন, আমি আর কখনও এমন কাজ করিব না···উঃ, আমি বড় তৃষ্ণার্ত—একটু জল···" এই পর্যন্ত বলিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল।

আমি একজন প্রহরীকে আদেশ করিলাম, "কূপ হইতে এক পাত্র জল আনিয়া ইহাকে দাও।"

জল আনীত হইলে সন্ন্যাসীর মুখের কাছে জলপাত্র ধরা হইল। কিন্তু সন্ন্যাসী নিশ্চেষ্ট, জলপানের কোনও আগ্রহ নাই।

প্রহরী বলিল, "জল আনিয়াছি—পান কর।"

সন্ন্যাসী নীরব নিস্পন্দভাবে পড়িয়া রহিল, কথা কহিল না। আমি তখন তাহার নিকটে গিয়া বলিলাম, "তৃষ্ণার্ত বলিতেছিলে, জল পান করিতেছ না কেন?"

সন্ন্যাসী তখন ক্ষীণস্বরে কহিল, "আমি জলপান করিব না।"

সহসা যে প্রহরী জল আনিয়াছিল, সে জলপাত্র ফেলিয়া দিয়া কাতরোক্তি করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। 'কি হইল, কি হইল'—বলিয়া সকলে তাহাকে ধরিয়া তুলিল। দেখা গেল, এই অল্পকালের মধ্যে তাহার মুখের অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মুখ তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে, চক্ষু অস্বাভাবিক উজ্জ্বল, সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। ক্রমে সৃক্কণী বহিয়া ফেন নির্গত হইতে লাগিল। বাক্য একেবারে রোধ হইয়া গিয়াছে। 'কি হইয়াছে?' 'কেন এরূপ করিতেছ?'—এইপ্রকার বহু প্রশ্নের উত্তরে সে কেবল ভূপতিত জলপাত্রটি অঙ্গুলিসংকেতে দেখাইতে লাগিল।

তারপর অর্ধ-দণ্ডের মধ্যে দারুণ যন্ত্রণায় হস্ত-পদ উৎক্ষিপ্ত করিতে করিতে উৎকট মুখভঙ্গি করিয়া প্রহরী ইহলোক ত্যাগ করিল। তাহার বিষ-বিধ্বস্ত দেহ মৃত্যুর করস্পর্শে শান্ত হইলে

পর, সমবেত সকলের দৃষ্টি সেই ভণ্ড সন্ন্যাসীর উপর গিয়া পড়িল। ক্রোধান্ধ জনতার সেই জিঘাংসু নিষ্ঠুর দৃষ্টির অগ্নিতে সন্ন্যাসী যেন পুড়িয়া কুঁকড়াইয়া গেল।

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব হইলে বোধ করি সেই ক্ষিপ্ত কর্মীদল সন্ন্যাসীর দেহ শত খণ্ডে ছিঁড়িয়া ফেলিত, কিন্তু সেই মুহূর্তে শ্রমিক-ব্যূহ ঠেলিয়া কর্মিক-জ্যেষ্ঠ বিশালকায় দিঙ্‌নাগ সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। ভূশায়িত সন্ন্যাসীর জটা ধরিয়া টানিয়া দাঁড় করাইয়া, সকলেব দিকে ফিরিয়া পরুষ-কণ্ঠে কহিল, "ভাই সব, এই ভণ্ড তপস্বী শত্রুর চর। আমাদেব প্রাণনাশের জন্য কূপের জল বিষ-মিশ্রিত করিয়াছে। ইহাব একমাত্র উচিত শাস্তি,—মৃত্যু ; অতএব সে শাস্তি আমরা ইহাকে দিব। কিন্তু এখন নয়। তোমরা সকলেই জান, যে কার্যে আমবা যাইতেছি, তাহাতে নরবলির প্রয়োজন। ভৈরবের তুষ্টিসাধন না করিলে আমাদের কার্য সুসম্পন্ন হইবে না। সুতরাং এখন কেহ ইহার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিও না। যথাসময় গঙ্গাব উপকূলে আমবা ইহাকে জীবন্ত সমাধি দিব। এই পাপাত্মার প্রেতমূর্তি অনন্তকাল ধরিয়া আমাদের দুর্গ পাহারা দিবে।"

দিঙ্‌নাগের কথায় সকলে ক্ষান্ত হইল।

তাবপব মৃত প্রহরীর দেহ সকলে মিলিয়া কূপ-সন্নিকটে এক বৃক্ষতলে সমাধিস্থ করিল এবং সন্ন্যাসীকে সেই বৃক্ষশাখায় হস্তপদ বাঁধিয়া ভাণ্ডবৎ ঝুলাইয়া রাখিল।

পবদিন প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া আমরা প্রায় বেলা তৃতীয় প্রহরে পাটলিগ্রামে উপস্থিত হইলাম। গঙ্গার উপকূলে জঙ্গলে পরিবৃত অতি ক্ষুদ্র একটি জনপদ—সর্বসাকল্যে বোধ করি পঞ্চাশটি দরিদ্র পরিবারের বাস। গ্রামবাসীরা অধিকাংশই নিষাদ কিংবা জালিক

—বনে পশু শিকার করিয়া এবং নদীতে মৎস্য ধরিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। মাঝে মাঝে বৃহৎ অরণ্যের মধ্যে বৃক্ষাদি কাটিয়া, ক্ষেত্র সমতল করিয়া, যব গোধূম চণক ইত্যাদিও উৎপন্ন করে। আমরা সদলবলে উপস্থিত হইলে গ্রামিকরা আমাদের আততায়ী মনে কবিয়া গ্রাম ছাড়িয়া অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমরা অনেক আশ্বাস দিলাম, কিন্তু কেহ শুনিল না, কিরাতভীত মৃগযূথের মতো গভীর বনমধ্যে অন্তর্হিত হইয়া গেল।

তখন আমরা অনাহূত যেখানে যাহা পাইলাম, তাহাই গ্রহণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিলাম। গ্রামের সংবৎসরের সঞ্চিত খাদ্য এক সন্ধ্যার আহারে প্রায় নিঃশেষ হইয়া গেল।

সেদিন আর কোনও কাজ হইল না। শ্রান্ত কর্মিকদল যে যেখানে পাইল ঘুমাইয়া রাত্রি কাটাইয়া দিল।

পরদিন প্রভাতে কাজের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। বণহস্তীব পৃষ্ঠে স্তূপীকৃত খাদ্য বস্ত্রাবাস প্রভৃতি যাবতীয় আবশ্যক বস্তু আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। ছাউনি ফেলিতে, প্রস্তরাদি যথাস্থানে সন্নি-বেশিত করিতে সমস্ত দিন কাহারও নিশ্বাস ফেলিবাব অবকাশ রহিল না।

দূতহস্তে মহামন্ত্রী দুর্গেব নক্সা পাঠাইয়াছেন, তাহা লইয়া মিহিরমিত্র ও দিঙ্‌নাগকে সঙ্গে করিয়া আমি দুর্গের স্থান-নির্ণয়েব জন্য নদীসংগমে গেলাম। বর্ষার কূলপ্লাবী দুই মহানদী স্ফীত তরঙ্গায়িত হইয়া ঘোররবে ছুটিয়াছে। গঙ্গা ধূসব, শোণ স্বর্ণাভ। দুই স্রোত যেখানে মিলিত হইয়াছে, সেখানে আবর্তিত জলরাশি ফেনপুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছে।

এই সংগমের দক্ষিণ উপকূলে দাঁড়াইয়া আমরা দেখিলাম যে, শোণ এবং সংযুক্ত প্রবাহের সন্ধিস্থলে এক বিশাল দ্বিভুজের সৃষ্টি

হইয়াছে—মনে হয় যেন, দুই নদী বাহু বিস্তার করিয়া দক্ষিণের তটভূমিকে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস করিতেছে। বহু পর্যবেক্ষণ ও বিচারের পর স্থির করিলাম যে, এই দ্বিভুজের মধ্যেই দুর্গ নির্মাণ করিতে হইবে। কারণ, তাহা হইলে দুর্গের দুই দিক্ নদীর দ্বারা বেষ্টিত থাকিবে, পরিখা-খননের প্রয়োজন হইবে না।

তারপর সেই স্থানের জঙ্গল পরিষ্কৃত করিবার জন্য লোক লাগিয়া গেল। বড় বড় পুরাতন বৃক্ষ কাটিয়া ভূমি সমতল করা হইতে লাগিল। হস্তীসকল ভূপতিত বৃক্ষকাণ্ড টানিয়া বাহিরে লইয়া ফেলিতে লাগিল। বৃক্ষপতনের মড়-মড় শব্দে, মানুষের কোলাহলে, হস্তী ও অশ্বের নিনাদে দিক্‌প্রান্ত প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। যেন বহুযুগব্যাপী নিদ্রার পর অবণ্যানী কোন দৈত্যের বিজয়নাদে চমকিয়া উঠিল।

সমস্ত দিন এইরূপ পরিশ্রমের পর রাত্রিতে আহারাদি শেষ করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দিঙ্‌নাগ আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল, "নায়ক, রাত্রি দ্বিপ্রহর সমাগত; আজ দুর্গাবন্তের পূর্বে দৈবকার্য করিতে হইবে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিরূপ দৈবকার্য?"

দিঙ্‌নাগ বলিল, "ইহারই মধ্যে ভুলিয়া গেলেন? সেই ভণ্ড তপস্বী—আজ তাহাকে জীবন্ত পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।"

তখন সকল কথা স্মরণ হইল। বলিলাম, "ঠিক কথা, তাহাকে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তা বেশ, তাহাকে বধ করিতেই হইবে, তখন এক কার্যে দুই ফল হউক। শত্রু নিপাত ও দেবতুষ্টি এক-সঙ্গেই হইবে। কিন্তু এই সকল দৈবকার্যের কি কি অনুষ্ঠান তাহা কি তোমাদের জানা আছে?"

দিঙ‌নাগ বলিল, "অনুষ্ঠান কিছুই নহে। বলিকে সুরাপান

করাইয়া যখন সে অচৈতন্য হইয়া পড়িবে, তখন তাহার কানে কানে বলিতে হইবে, 'তুমি চিরদিন প্রেতদেহে এই দুর্গ রক্ষা করিতে থাক।'—এই বলিয়া তাহাকে জীবন্ত অবস্থায় পুঁতিয়া ফেলিতে হইবে।"

আমি ঈষৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি এত বিধি-ব্যবস্থা জানিলে কোথা হইতে ?"

দিঙ্‌নাগ হাসিয়া বলিল, "এ কার্য আমি পূর্বে করিয়াছি। ধনশ্রী শ্রেষ্ঠী যখন গুপ্ত রত্নাগার মাটির নিচে তৈয়ার করে, তখন আমিই কুলিক ছিলাম। সেই সময় অরণ্য হইতে এক শবর ধরিয়া আনিয়া শ্রেষ্ঠী এই নরযাগ সম্পন্ন করে। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।"

আমি বলিলাম, "তবে এ কার্যও তুমিই কর।"

দিঙ্‌নাগ বলিল, "করিব। কিন্তু নায়ক, কার্যকালে আপনাকেও উপস্থিত থাকিতে হইবে। ইহাই বিধি।"

"বেশ থাকিব।"

দিঙ্‌নাগ চলিয়া যাইবার পর নানা চিন্তায় মগ্ন হইয়া আছি, এমন সময় সে ছুটিতে ছুটিতে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "নায়ক, সর্বনাশ! সন্ন্যাসী আমাদের ফাঁকি দিয়াছে!"

"ফাঁকি দিয়াছে ?"

"বিষপান করিয়াছে। তাহার কবচের মধ্যে বিষ লুকানো ছিল, জীবন্ত সমাধির ভয়ে তাহাই খাইয়া মরিয়াছে। এখন উপায় ?"

"কিসের উপায় ?"

"মানস করিয়াছি, বলি না দিলে যে সর্বনাশ হইবে! রুদ্র কুপিত হইবেন।" দিঙ্‌নাগ মাটিতে বসিয়া পড়িল।

চিন্তার কথা বটে। নির্বোধ সন্ন্যাসীটা আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে পারিল না! পাছে আমাদের একটু উপকার হয়, তাই

তাড়াতাড়ি বিষপান করিয়া বসিল। এ দিকে আমন্ত্রিত দেবতা প্রতীক্ষা করিয়া আছেন। অন্য বলি কোথায় পাওয়া যায়?

বিশেষ ভাবিত হইয়া পড়িয়াছি, এরূপ সময় শিবিরের প্রহরী আসিয়া সংবাদ দিল, "কতকগুলা মুণ্ডিত-মস্তক ভিখারী ছাউনিতে আশ্রয় খুঁজিতেছিল, ধরিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছি। আজ্ঞা হয় তো লইয়া আসি।"

দিঙ্‌নাগ লাফাইয়া উঠিয়া মহানন্দে চিৎকার করিয়া উঠিল, "জয় রুদ্রেশ্বর, জয় ভৈরব!...নায়ক, দেবতা স্বয়ং বলি পাঠাইয়াছেন!"

এত সহজে যে বলি-সমস্যাব মীমাংসা হইয়া যাইবে তাহা ভাবি নাই। ভিখারী অপেক্ষা উত্তম বলি আর কোথায় পাওয়া যাইবে? দিঙ্‌নাগ ঠিকই বলিয়াছে, দেবতা স্বয়ং বলি পাঠাইয়াছেন।

সর্বসুদ্ধ চারি পাঁচটি ভিখারী,—পরিধানে কৌপীন, সংঘাটি ও উত্তরীয়, হস্তে ভিক্ষাপাত্র,—আমার সম্মুখে আনীত হইল। ভিক্ষুক-গণ সকলেই বয়স্থ;—কেবল একটি বৃদ্ধ,—বয়স বোধ করি সত্তর অতিক্রম করিয়াছে।

বৃদ্ধ স্মিত হাস্যে বলিলেন, "মঙ্গল হউক!"

এই বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সহসা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যেন তড়িৎস্পৃষ্ট হইয়া জাগিয়া উঠিল। আমি কে, কোথায় আছি, এক মুহূর্তে সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। কেবল বুকের মধ্যে এক অদম্য বাষ্পোচ্ছ্বাস আলোড়িত হইয়া উঠিল। কে ইনি? এত সুন্দর, এত মধুর, এত করুণাসিক্ত মুখকান্তি তো মানুষের কখনও দেখি নাই। দেবতার মুখে যে জ্যোতির্মণ্ডল কল্পনা করিয়াছি, আজ এই বৃদ্ধের মুখে তাহা প্রথম প্রত্যক্ষ করিলাম। এই জ্যোতির স্ফুরণ বাহিরে অতি অল্প, কিন্তু চক্ষুর মধ্যে দৃষ্টি করিলেই মনে হয়,

ভিতরে অমিতদ্যুতি স্থির সৌদামিনী জ্বলিতেছে। কিন্তু সে সৌদামিনীতে জ্বালা নাই, তাহা অতি স্নিগ্ধ, অতি শীতল, যেন হিম-নির্ঝরিণীর শীকর-নিষিক্ত।

সে মূর্তির দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আমার প্রাণের মধ্যে একটি শব্দ কেবল রণিত হইতে লাগিল,—'অমিতাভ! অমিতাভ!'

আমি বাক্‌রহিত হইয়া বসিয়া আছি দেখিয়া তিনি আবার হাসিলেন। অপূর্ব প্রভায় সে মুখ আবার সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, "বৎস, আমরা যাযাবর ভিক্ষু, কুশীনগর যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছি। অদ্য রাত্রির জন্য তোমার আশ্রয়ভিক্ষা করি।"

অবরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি কে?"

তাঁহার একজন সহচর উত্তর করিলেন, "শাক্যসিংহ গৌতমের নাম কখনও শুন নাই?"

শাক্যসিংহ? ইনিই তবে সেই শাক্যবংশের রাজ্যভ্রষ্ট যুবরাজ! মহামন্ত্রী বর্ষকারের কথা মনে পড়িল। ইঁহারই উদ্দেশ্যে তিনি বলিয়াছিলেন,—ধূর্ত, কপটী, পরস্বলুব্ধ! মরি মরি, কে ধূর্ত কপটী? মনে হইল, মানুষ তো অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু আজ এই প্রথম মানুষ দেখিলাম। হায়, মহামন্ত্রী বর্ষকার, তুমি এই পুরুষসিংহকে দেখ নাই, কিংবা দেখিয়াও আত্মাভিমানে অন্ধ ছিলে। নহিলে এমন কথা মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতে না।

বুকের মধ্যে প্রবল রোদনের উচ্ছ্বাস সমস্ত দেহকে কম্পিত করিতে লাগিল। আমার অতিবাহিত জীবনের অপরিমেয় শূন্যতা, অশেষ দৈন্য, যেন এককালে মূর্তি ধরিয়া আমার সম্মুখে দেখা দিল! কি পাইয়া এত দিন ভুলিয়া ছিলাম!

আমি উঠিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বলিলাম,

"অমিতাভ, আমি অন্ধ, আমাকে চক্ষু দাও, আমাকে আলোকের পথ দেখাইয়া দাও।"

অমিতাভ আমাকে ধরিয়া তুলিলেন। মস্তকে করার্পণ করিয়া বলিলেন, "পুত্র, আশীর্বাদ করিতেছি, তোমার অন্তরের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত হইবে আপনিই আলোকের পথ দেখিতে পাইবে।"

আমি আবার তাঁহার চরণ ধারণ করিয়া বলিলাম, "না শ্রীমন্, আমার হৃদয় অন্ধকার। আজ প্রথম তোমার মুখে দিব্যজ্যোতি দেখিয়াছি। ঐ জ্যোতির কণামাত্র আমাকে দান কর।"

একজন ভিক্ষু বলিলেন, "শাস্তা, আপনি ইহাকে ত্রিশরণ দান করুন।"

শাক্যসিংহ কহিলেন, "আনন্দ, তাহাই হউক।" আমার মস্তকে হস্ত রাখিয়া বলিলেন, "পুত্র, তুমি ত্রিশরণ গ্রহণ করিয়া গৃহস্থের অষ্টশীল পালন কর। আশীর্বাদ করি, যেন বাসনামুক্ত হইতে পার।"

তখন বুদ্ধের চরণতলে বসিয়া তদ্গতকণ্ঠে তিনবার ত্রিশরণ মন্ত্র উচ্চারণ করিলাম।

অদূরে দাঁড়াইয়া দিঙ্‌নাগ—দুর্ধর্ষ, নিষ্করুণ, অসুরপ্রকৃতি দিঙ্-নাগ -গলদশ্রু হইয়া কাঁদিতে লাগিল। তাহার বিকৃত কণ্ঠ হইতে কি কথা বাহির হইতে লাগিল বুঝা গেল না।

এ যেন কয়েক পলের মধ্যে এক মহা ভূমিকম্পে আমাদের অতীত জীবন ধূলিসাৎ হইয়া গেল। কীট ছিলাম, এক মুহূর্তে মানুষ হইয়া গেলাম।

পরদিন উষাকালে তথাগত কুশীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হিরণ্যবাহুর সুবর্ণ-সৈকতে দাঁড়াইয়া আমার হস্তধারণ করিয়া তিনি

কহিলেন, "পুত্র, আমি চলিলাম। হিংসায় হিংসার ক্ষয় হয় না, বৃদ্ধি হয়—এ কথা স্মরণ রাখিও।"

বাষ্পাকুল-স্বরে কহিলাম, "শাস্তা, আবার কত দিনে সাক্ষাৎ পাইব?"

সেই হিমবিদ্যুতের ন্যায় হাসি তাঁহার ওষ্ঠাধরে খেলিয়া গেল, বলিলেন, "আমি কুশীনগর যাইতেছি, আর ফিরিব না।"

তারপর বহুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে গঙ্গা-শোণ-সংগমে দুর্গভূমির প্রতি তাকাইয়া রহিলেন। শেষে স্বপ্নাবিষ্ট কণ্ঠে কহিলেন, "আমি দেখিতেছি, তোমার এই কীর্তি বহু-সহস্রবর্ষ স্থায়ী হইবে। এই ক্ষুদ্র পাটলিগ্রাম ও তোমার নির্মিত এই দুর্গ এক মহীয়সী নগরীতে পরিণত হইবে। বাণিজ্যে, ঐশ্বর্যে, শিল্পে, কারুকলায়, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে পৃথিবীতে অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিবে। সদ্ধর্ম এই-স্থানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। তোমার কীর্তি অবিনশ্বর হউক।"

এই বলিয়া, পুনর্বার আমাকে আশীর্বাদ করিয়া, দিব্যদর্শী পরিনির্বাণের পথে যাত্রা করিলেন।

মৃৎপ্রদীপ

প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মাটি খুঁড়িয়া অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক জীবের যে সকল অস্থি-কঙ্কাল বাহির করেন, তাহাতে রক্ত-মাংস সংযোগ করিয়া তাহার জীবিতকালের বাস্তব মূর্তিটি তৈয়ারি করিতে গিয়া অনেক সময় তাঁহাদিগকে নিছক কল্পনার আশ্রয় লইতে হয়। ফলে যে মূর্তি সৃষ্টি হয়, সত্যের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে কি না এবং থাকিলেও তাহা কতদূর, সে সম্বন্ধে মতভেদ ও বিবাদ-বিসংবাদ কিছুতেই শেষ হয় না।

আমাদের দেশের ইতিহাসও কতকটা ঐ ভূ-প্রোথিত অতিকায় জন্তুর মতো। যদি বা বহুক্লেশে সমগ্র কঙ্কালটুকু পাওয়া যায়, তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হওয়া দূরের কথা, তাহার সজীব চেহারাখানা যে কেমন ছিল তাহা আংশিকভাবে প্রতিপন্ন হইবার পূর্বেই বড় বড় পণ্ডিতেরা অত্যন্ত তেরিয়া হইয়া এমন মারামারি কাটাকাটি শুরু করিয়া দেন যে, রথি-মহারথী ভিন্ন অন্য লোকের সে কুরুক্ষেত্রের দিকে চক্ষু ফিরাইবার আর সাহস থাকে না। এবং যুদ্ধের অবসানে শেষ পর্যন্ত সেই কঙ্কালের বিভিন্ন হাড় কয়খানাই রণাঙ্গণে ইতস্ততঃ পড়িয়া থাকিতে দেখা যায়।

তাই, যখনই আমাদের জন্মভূমির এই কঙ্কালসার ইতিহাসখানা আমার চোখে পড়ে তখনই মনে হয়, ইহা হইতে আসল বস্তুটির ধারণা করিয়া লওয়া সাধারণ লোকের পক্ষে কত না দুরূহ ব্যাপার। যে মৃৎপ্রদীপের কাহিনী লিখিতে বসিয়াছি, তাহারই কথা ধরি না কেন। প্রাচীন পাটলিপুত্রের যে সামান্য ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া

বাহির করা হইয়াছে, তাহারই চারিপাশে স্বপ্নাবিষ্টের মতো ঘুরিতে ঘুরিতে জঞ্জাল-স্তূপের মধ্যে এই মৃৎপ্রদীপটি কুড়াইয়া পাইয়াছিলাম। নিতান্ত একেলে সাধারণ মাটির প্রদীপের মতোই তাহার চেহারা, ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া প্রায় কাগজের মতো পাতলা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এতকাল পরেও তাহার মুখের কাছটিতে একটুখানি পোড়া দাগ লাগিয়া আছে। এই নোনাধরা জীর্ণ বিশেষত্ববর্জিত প্রদীপটি দেখিয়া কে ভাবিতে পারে যে, উহার মুখের ঐ কালির দাগটুকু একদিন ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠাকে একেবারে কালো করিয়া দিয়াছিল এবং উহারই ঊর্ধ্বোত্থিত ক্ষুদ্র শিখার বহ্নিতে একটা রাজ্য পুড়িয়া ছারখার হইয়া গিয়াছিল!

অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকেরা বোধ করি অবহেলা করিয়া এই তুচ্ছ প্রদীপটা ফেলিয়া দিয়াছিলেন, মিউজিয়ামে স্থান দেন নাই। আমি সযত্নে কুড়াইয়া আনিয়া সন্ধ্যার পর আমার নির্জন ঘরে মধু-মিশ্রিত গব্য ঘৃত দিয়া উহা জ্বালিলাম। কতদিন পরে এ প্রদীপ আবার জ্বলিল? পুরাবৃত্তের কোন্ মসীলিপ্ত অধ্যায়কে আলোকিত করিল? বিজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা তাহা কোথা হইতে জানিবেন? উহার অঙ্গে তো তাম্রশাসন-শিলালিপি লটকানো নাই! সে কেবল আমার,—এই জাতিস্মরেব মস্তিষ্কেব মধ্যে দুরপনেয় কলঙ্কের কালিমা দিয়া মুদ্রিত হইয়া আছে।

প্রদীপ জ্বলিলে যখন ঘরের দ্বাব বন্ধ করিয়া বসিলাম, তখন নিমেষমধ্যে এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল ঘটিয়া গেল। স্তম্ভিত কাল যেন অতীতের সঙ্গী এই প্রদীপটাকে আবার জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে পিছু ফিরিয়া তাকাইয়া রহিল। এই পাটলিপুত্র নগর মন্ত্রবলে পরিবর্তিত হইয়া কবেকার এক অখ্যাত মগধেশ্বরের মহাস্থানীয় রাজধানীতে পরিণত হইল। আর আমার মাথার মধ্যে

যে স্মৃতিপুত্তলিগুলি এতক্ষণ স্বপ্নের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তাহারা সজীব হইয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ঘটনা—কত নগণ্য অনাবশ্যক কথা—এই বর্তিকার আলোকে দীপ্তিমান জীবন্ত স্পষ্ট হইয়া উঠিল। আমার সম্মুখ হইতে বর্তমান মুছিয়া একাকার-হইয়া গেল, কেবল অতীতের বহুদূর জন্মান্তরের স্মৃতি ভাস্বর হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

সেই প্রদীপ সম্মুখে ধরিয়া তাহারই আলোতে আজ এই কাহিনী লিখিতেছি।

আজ হইতে ষোল শতাব্দী আগেকার কথা।

ক্ষুদ্র ভূস্বামী ঘটোৎকচগুপ্তের পুত্র চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজবংশে বিবাহ করিয়া শ্যালককুলের বাহুবলে পাটলিপুত্র দখল করিয়া রাজা হইলেন। রাজা হইলেন বটে, কিন্তু নামে মাত্র। পট্টমহাদেবী লিচ্ছবিদুহিতা কুমারদেবীর দুর্ধর্ষ প্রতাপে চন্দ্রগুপ্ত মাথা তুলিতে পারিলেন না। রাজমুদ্রায় রাজার মূর্তির সহিত মহাদেবীর মূর্তি ও লিচ্ছবিকুলের নাম উৎকীর্ণ হইতে লাগিল। রাজার নামে রাণী স্বেচ্ছামত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। রাজা একবার নিজ আজ্ঞা প্রচার করিতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার আজ্ঞা কেহ মানে না। চন্দ্রগুপ্ত বীরপুরুষ ছিলেন, তাঁহার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল; কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। নিষ্ফল ক্রোধে শক্তিশালী শ্যালককুলের প্রতি বক্রদৃষ্টিপাত করিয়া তিনি মৃগয়া, সুরা ও দ্যূতক্রীড়ায় মনোনিবেশ করিলেন।

প্রজাদের তাহাতে বিশেষ আপত্তি ছিল না। রাজা বা রাণী যিনিই রাজত্ব করুন, তাহাদের কিছু আসে যায় না। মহামারী, দুর্ভিক্ষ অথবা যুদ্ধের হাঙ্গামা না থাকিলেই তাহারা সন্তুষ্ট। কাণ্ব-বংশ লুপ্ত হইবার পর বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ অন্তর্বিবাদে দেশ

অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। প্রকাণ্ড মগধ সাম্রাজ্য বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন সতীদেহের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়া বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের সমষ্টিতে দাঁড়াইয়াছিল। ক্ষুদ্র রাজারা ক্ষুদ্র কারণে পরস্পর কলহ করিয়া প্রজার দুর্গতি বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। এই সময় চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র ও তাহার পারিপার্শ্বিক ভূখণ্ড অধিকার করিয়া কিছু শান্তি আনয়ন করিয়াছিলেন। শান্তিতে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পাইয়া প্রজারা তৃপ্ত ছিল, রাজা বা রাণী—কে প্রকৃতপক্ষে রাজ্যশাসন করিতেছেন, তাহা দেখিবার তাহাদের প্রয়োজন ছিল না।

যাহা হউক, তরুণী পট্টমহিষী একমাত্র শিশুপুত্র সমুদ্রগুপ্তকে ক্রোড়ে লইয়া রাজ-অবরোধ হইতে প্রজাশাসন করিতেছেন, দেশে নিরুপদ্রব শান্তিশৃঙ্খলা বিরাজ করিতেছে, এমন সময় একদিন শরৎকালের নির্মল প্রভাতে মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নগরোপকণ্ঠের বনমধ্যে মৃগয়া করিতে গেলেন। মহারাজ মৃগয়ায় যাইবেন, সুতরাং পূর্ব হইতে বনমধ্যে বস্ত্রাবাস ছাউনি পড়িল। কারুকার্যখচিত রক্তবর্ণের পট্টাবাস সকল অকালপ্রফুল্ল কিংশুকগুচ্ছের ন্যায় বনস্থলী আলোকিত করিল। কিঙ্করী, নর্তকী, তাম্বূলিক, সংবাহক, সূপকার, নহাপিত প্রভৃতি বহুবিধ দাসদাসী কর্ম-কোলাহলে ও আনন্দকলরবে কাননলক্ষ্মীর বিশ্রব্ধ শান্তি ভঙ্গ করিয়া দিল। তারপর যথাসময়ে পারিষদ-পরিবেষ্টিত হইয়া সুরারুণনেত্র মগধেশ্বর মৃগয়াস্থলে উপস্থিত হইলেন।

প্রভাতে দ্যূতক্রীড়া ও তিত্তিরি-যুদ্ধ দর্শন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত আনন্দে কালহরণ করিলেন। দ্বিপ্রহরে পানভোজনের পর অন্য সকলকে শিবিরে রাখিয়া মাত্র চারিজন বয়স্য সঙ্গে মহারাজ অশ্বারোহণে অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। বয়স্যরা সকলেই মহারাজের সমবয়স্ক যুবা, সকলেই সমান লম্পট ও উচ্ছৃঙ্খল।

চাটুমিশ্রিত ব্যঙ্গ-পরিহাস করিতে করিতে তাহারা মহারাজের সঙ্গে চলিল।

মৃগ-অন্বেষণে বিচরণ করিতে করিতে প্রায় দিবা তৃতীয় প্রহরে এক ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর কূলে সহসা তাঁহাদের গতিরোধ হইল। সর্বাগ্রে মহারাজ দেখিলেন, তটিনীর উচ্চ তটের উপর ছিন্নমৃণাল কুমুদিনীর মতো এক নারীমূর্তি পড়িয়া আছে। দেহে বস্ত্র কিংবা আভরণ কিছুই নাই—সম্পূর্ণ নগ্ন। কণ্ঠে, প্রকোষ্ঠে, কর্ণে অল্প রক্ত চিহ্ন। দেখিলে বুঝা যায়, দস্যুতে ইহার সর্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া পলাইয়াছে।

রাজা ত্বরিতপদে অশ্ব হইতে নামিয়া রমণীমূর্তির নিকটে গেলেন; নির্নিমেষ নেত্রে তাহার নগ্ন দেহ-লাবণ্যের দিকে চাহিয়া রহিলেন। নারীর বয়স ষোড়শ কি সপ্তদশের অধিক হইবে না। নবোদ্ভিন্ন যৌবনের পরিপূর্ণ বিকশিত রূপ; রাজা দুই চক্ষু ভরিয়া পান করিতে লাগিলেন। তাহার পর নতজানু হইয়া সন্তর্পণে বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া দেখিলেন—প্রাণ আছে, দ্রুত হৃৎস্পন্দন অনুভূত হইতেছে।

বয়স্য চারিজন ইতিমধ্যে রাজার পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল ও লুব্ধদৃষ্টিতে সংজ্ঞাহীনার অনাবৃত সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। সহসা রাজা তাহাদের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "এ নারী কাহার?"

রাজার আরক্ত মুখমণ্ডল ও চক্ষুর ভাব দেখিয়া বয়স্যগণ পরিহাস করিতে সাহসী হইল না। একজন কুণ্ঠাজড়িত কণ্ঠে বলিল, "রাজ্যের সকল নর-নারীই মহারাজের।"

মহারাজ বোধ করি অন্য কিছু ভাবিয়া এই প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ উত্তর পাইয়া তিনি প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে দ্বিতীয় বয়স্যের দিকে ফিরিলেন। পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, "এ নারী কাহার?"

মন বুঝিয়া বয়স্য বলিল, "মহারাজের।"

তৃতীয় বয়স্যের দিকে ফিরিয়া চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসু নেত্রে চাহিলেন।

কিন্তু তৃতীয় বয়স্য—সে অন্তরের দুর্দম লালসা গোপন করিতে পারিল না—ঈষৎ হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "দস্যু-উপক্রুতা নারী শ্রীমৎ মগধেশ্বরের ভোগ্যা নয়। এই নারীদেহটা মহারাজ অধমকে দান করুন।"

বারুণী-কষায়িত নেত্র কিছুক্ষণ তাহার মুখের উপর স্থাপন করিয়া মহারাজ উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "বিট, স্বর্গের পারিজাত লইয়া তুই কি করিবি? এ নারী আমার!"—এই বলিয়া উষ্ণীষ খুলিয়া সূক্ষ্ম বস্ত্রজালে রমণীর সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিলেন।

লুব্ধ বয়স্য তখনও আশা ছাড়ে নাই—রূপসীর প্রতি সতৃষ্ণ একটা কটাক্ষ হানিয়া বলিল, "কিন্তু মহারাজ, এ অনুচিত। পট্টমহাদেবী শুনিলে…"

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ন্যায় রাজা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন, "পট্টমহাদেবী? রে পীঠমর্দ, পট্টমহাদেবী আমার ভর্ত্রী নয়, আমি তাঁর ভর্তা—বুঝিলি? এ রাজ্য আমার, এ নারী আমার —পট্টমহাদেবীর নয়।"

এই আকস্মিক উগ্র ক্রোধে বয়স্যগণ ভয়ে নিশ্চল বাক্‌শূন্য হইয়া গেল। চন্দ্রগুপ্ত নিজেকে কিঞ্চিৎ সংযত করিয়া কহিলেন, "এই নারীকে আমি মহিষীরূপে গ্রহণ করিলাম। বয়স্যগণ, মহাদেবীকে প্রণাম কর।"

যন্ত্রচালিতবৎ বয়স্যগণ প্রণাম করিল।

তখন সেই সংজ্ঞাহীন দেহ সন্তর্পণে বক্ষে তুলিয়া লইয়া মহারাজ অশ্বারোহণে শিবিরে ফিরিয়া চলিলেন। মূর্ছিতার অবেণীবদ্ধ মুক্ত কুন্তল কৃষ্ণ ধূমকেতুর মতো পশ্চাতে উড়িতে উড়িতে চলিল।

শিবিরে ফিরিয়া সংজ্ঞালাভ করিবার পর রমণী যে পরিচয় দিল তাহা এইরূপ :—

তাহার নাম সোমদত্তা। সে শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠীর কন্যা, পিতাব সহিত চম্পাদেশে যাইতেছিল, পথে আটবিক দস্যু কর্তৃক অপহৃতা হয়। তাহাব পিতাকে দস্যুরা মারিয়া ফেলে। অতঃপর দস্যুপতি তাহাব রূপযৌবন দেখিয়া তাহাকে আত্মসাৎ করিতে মনস্থ করে। অন্য দস্যুগণ তাহাতে ঘোরতব আপত্তি করিল। ফলে তাহাবা পবস্পবের সহিত বিবাদ-বিসংবাদ আবম্ভ করিল এবং একে অন্যেব পশ্চাদ্ধাবন কবিতে গিয়া, যাহাকে লইয়া কলহ তাহাকেই অবক্ষিত ফেলিয়া গেল। যাইবাব সময় একজন চতুব দস্যু, পাছে সোমদত্তা কোথাও পলায়ন কবে, এই ভয়ে তাহার বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাহাকে অজ্ঞান করিয়া রাখিয়া যায়।

যথাকালে চন্দ্রগুপ্ত সোমদত্তাকে দোলায় তুলিয়া নগরে লইয়া গেলেন। শাস্ত্রমত বিবাহ হইল কি না জানা গেল না, যদি বা হইযা থাকে তাহা গান্ধর্ব কিংবা পৈশাচ-জাতীয়। যাহা হউক, দাসীসহচবীপবিবৃতা সোমদত্তা বাজপুবীর পুবস্ত্রী হইয়া বাস কবিতে লাগিল। তাহাব অবস্থানের জন্য মহাবাজ একটি স্বতন্ত্র মহল নির্দেশ কবিযা দিলেন।

কুমাবদেবী বাজার এই দুষ্যন্ত-উপাখ্যান শুনিলেন, কিন্তু ঘৃণাভবে কোনও কথা বলিলেন না। বিশেষতঃ, সেকালে বাজাদের পক্ষে ইহা এমন কিছু গর্হিত কার্য ছিল না। একাধিক পত্নী ও উপপত্নী সকল রাজ-অন্তঃপুবেই স্থান পাইত। এমন কি, প্রকাশ্য বেশ্যাকে বিবাহ কবাও বাজন্যসমাজে অপ্রচলিত ছিল না। কুমার-দেবী অবিচলিত নিষ্ঠাব সহিত পুত্রকে সম্মুখে রাখিয়া রাজকার্য

পরিচালন করিতে লাগিলেন। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত মধুভাণ্ডের নিকট ষট্‌পদের মতো সোমদত্তার পদপ্রান্তে পড়িয়া রহিলেন।

এইরূপে ছয় মাস কাটিল।

তারপর একদিন চূত-মধূক-সুগন্ধি বসন্তকালের প্রারম্ভে জলস্থল অন্ধকার করিয়া পঙ্গপালের মতো এক বিরাট বাহিনী দেশ ছাইয়া ফেলিল। ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখমাত্র আছে। পুষ্করণা নামক মরুরাজ্যের অধিপতি চন্দ্রবর্মা দিগ্বিজয় যাত্রার পথে মগধ আক্রমণ করিলেন। হীনবীর্য মগধ বিনা যুদ্ধে অধিকৃত হইল। কিন্তু চন্দ্রবর্মা যাহা সংকল্প করিয়াছিলেন তাহা এত সহজে সিদ্ধ হইল না,—তিনি পাটলিপুত্রে জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিতে পারিলেন না। তাঁহার বিশাল সেনা-সমুদ্রের মধ্যস্থলে পাটলিপুত্র দুর্গ দশ লৌহদ্বারে ইন্দ্রকীলক আঁটিয়া দিয়া ক্ষুদ্র পাষাণদ্বীপের মতো জাগিয়া রহিল।

মগধেশ্বর তখন সোমদত্তার গজদন্ত পালঙ্কে শুইয়া ঘুমাইতেছিলেন; প্রহরিণীর মুখে এই বার্তা শুনিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। তাঁহার বহুকাললুপ্ত ক্ষাত্রতেজ নিমেষের জন্য জাগ্রত হইয়া উঠিল, কক্ষের চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "আমার বর্ম?"—বলিয়াই তাঁহার কুমারদেবীর কথা স্মরণ হইল, মুখের দীপ্তি নিবিয়া গেল। ক্ষীণ শ্লেষের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আক্রমণ করিয়াছে তা আমি কি করিব! পট্টমহাদেবীর কাছে যাও।"—বলিয়া পুনশ্চ শয্যায় শয়ন করিলেন।

সোমদত্তা প্রাসাদচূড়া হইতে দ্রুত চঞ্চলপদে নামিয়া আসিয়া দেখিল, রাজা পূর্ববৎ নিশ্চিন্তে ঘুমাইতেছেন। তাহার শিখরতুল্য দশনে বিদ্যুতের ন্যায় হাসি খেলিয়া গেল। রাজার মস্তকে

মৃদু করস্পর্শ করিয়া অস্ফুটস্বরে কহিল, "ঘুমাও বীরশ্রেষ্ঠ! ঘুমাও!"

এ দিকে প্রহরিণী পট্টমহাদেবীকে গিয়া সংবাদ দিল। কুমারদেবী তখন ষষ্ঠবর্ষীয় কুমার সমুদ্রগুপ্তকে শিক্ষা দিতেছিলেন: "পুত্র, তুমি লিচ্ছবিকুলের দৌহিত্র, এ কথা কখনও ভুলিও না। পাটলিপুত্র তোমার পাদপীঠ মাত্র। ভরতের মতো, মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের মতো, চণ্ডাশোকের মতো এই সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত বসুন্ধরা তোমার সাম্রাজ্য, —এ কথা স্মরণ রাখিও। তুমি বাহুবলে গুর্জর হইতে সমতট, হিমাদ্রি হইতে অনার্য পাণ্ড্য-দেশ পর্যন্ত পদানত করিবে। তোমার যজ্ঞীয় অশ্ব উত্তরাপথে ও দক্ষিণাপথে, আর্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে সমান অপ্রতিহত হইবে।"

বালক রত্নখচিত ক্রীড়াকন্দুক হস্তে লইয়া গম্ভীরমুখে মাতার কথা শুনিতেছিল।

এমন সময় প্রতিহারিণীর মুখে ভয়ংকর সংবাদ শুনিয়া মহাদেবীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল; ক্ষণকাল নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। একবার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করেন, আর্যপুত্র কোথায়। কিন্তু সে ইচ্ছা নিরোধ করিয়া বলিলেন, "শীঘ্র কঞ্চুকীকে মহামাত্যের কাছে পাঠাও—এখনি তাঁহাকে আমার সম্মুখে উপস্থিত করুক। দুর্গের দ্বার সকল রুদ্ধ হউক। বিনা যুদ্ধে মহাস্থানীয় শত্রুর হস্তে সমর্পণ করিব না।"

মহাদেবীর আদেশের প্রয়োজন ছিল না, মহাসচিব ও সান্ধি-বিগ্রহিক পূর্বেই দুর্গ-দ্বার রোধ করিয়াছিলেন। প্রাকারে প্রাকারে ভল্লহস্তে সতর্ক প্রহরী ঘুরিতেছিল, সিংহদ্বারগুলির উপরে বৃহৎ কটাহে তৈল উত্তপ্ত হইতেছিল। লৌহজালিকে সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া স্নায়ুজ্যাযুক্ত ধনুহস্তে ধানুকিগণ ইন্দ্রকোষে লুক্কায়িত থাকিয়া

পরিখা-পারস্থিত শত্রুর উপর বিষ-বিদূষিত শর নিক্ষেপ করিতে-ছিল। প্রাকারের হস্তিনখমধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সেনানীগণ শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিলেন। বুভুক্ষিত কুম্ভীরদল পরিখার কমলবনের মধ্যে খাদ্যান্বেষণে ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছিল। বাহিরে শত্রুসৈন্য মাঝে মাঝে একযোগে দুর্গদ্বার আক্রমণ করিতেছিল। তখন মকরমুখ হইতে প্রচণ্ডবেগে তপ্ত-তৈল বর্ষিত হইতেছিল। আক্রমণকারীরা হতাহত সহচরদিগকে দুর্গদ্বারে ফেলিয়া ভগ্নোদ্যমে ফিরিয়া যাইতেছিল।

পূর্ণ একদিন এইভাবে যুদ্ধ হইল। চন্দ্রবর্মা রণহস্তীর দ্বারা দুর্গদ্বার ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সে চেষ্টাও বিফল হইল। সর্বাঙ্গে বাণবিদ্ধ হস্তী মাহুতকে ফেলিয়া দিয়া আর্তনাদ করিতে করিতে পলায়ন করিল। চন্দ্রবর্মা দেখিলেন, যুদ্ধ করিয়া দুর্গজয় সহজ নহে।

তখন তাঁহার সৈন্য যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া দুর্গ বেষ্টন করিয়া বসিল। ক্রোশের পর ক্রোশ, যোজনের পর যোজন ব্যাপ্ত করিয়া তাহাদের শিবির পড়িল। নদীতে কাতারে কাতারে তরণী আসিয়া দুর্গ-প্রাকারের বাহিরে গণ্ডী রচনা করিল। পাটলিপুত্রে পিপীলিকারও আগম-নিগমের পথ রহিল না।

ভিতরে মহামাত্য কুমারদেবীকে গিয়া সংবাদ দিলেন, "আশু ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু বর্বর চন্দ্রবর্মা আমাদের অনাহারে শুকাইয়া মারিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখা যাক্, কতদূর কি হয়।"

দিগ্বিজয়ী রণপণ্ডিত চন্দ্রবর্মার উদ্দেশ্য কিন্তু দুই প্রকার ছিল। ক্ষুদ্র দুর্বল পাটলিপুত্র অচিরাৎ দখল করিতে তিনি বড় ব্যগ্র ছিলেন না। হইলে ভালো, না হইলেও বিশেষ ক্ষতি নাই; আপাততঃ মগধের অন্যত্র জয়স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেই চলিবে। কিন্তু

তাঁহার স্থল-সৈন্য বহুদূর পথ যুদ্ধ করিতে করিতে আসিয়া পরিশ্রান্ত—তাহাদের কিছুদিন বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই তিনি এই অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজার দেশে নিরুপদ্রবে ক্লান্তিবিনোদনের জন্য বসিলেন। গঙ্গার স্রোতে তাঁহার নৌবহর নোঙ্গর ফেলিল। দুর্গাবরোধ ও শ্রান্তি অপনোদন একসঙ্গে চলিল।

দুর্গ অবরোধের পঞ্চম দিবসে মহামাত্য আসিয়া রাণীকে জানাইলেন যে, দুর্গের খাদ্যভার কমিতে আরম্ভ করিয়াছে—শীঘ্র ইহার কিছু বিধি-ব্যবস্থা করা আবশ্যক।

মন্ত্রীর সহিত কুমারদেবী বহুক্ষণ পরামর্শ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "গোপনে খাদ্য আনিবার কোনও পথ কি নাই ?"

সচিব বলিলেন, "হয়তো আছে, কিন্তু আমরা জানি না। নদীপথে খাদ্য আনা যাইতে পারিত, কিন্তু সে পথও বন্ধ। দুর্বৃত্ত চন্দ্রবর্মা নৌকা দিয়া ব্যূহ সাজাইয়া রাখিয়াছে।"

"তবে এখন উপায় ?"

"একমাত্র উপায় আছে।"

তারপর আরও অনেকক্ষণ পরামর্শ চলিল।

শেষে মহামাত্য বিদায় হইলে পর কুমারদেবী অলক্ষিতে প্রাসাদশীর্ষে উঠিলেন। অঞ্চলের ভিতর হইতে রক্তচক্ষু ধূম্রবর্ণ দূত-পারাবত বাহির করিয়া আকাশে উড়াইয়া দিলেন। পারাবত দুইবার প্রাসাদ পরিক্রমণ করিয়া উত্তরাভিমুখে ধাবিত হইল। যতক্ষণ দেখা যায়, কুমারদেবী আকাশের সেই কৃষ্ণবিন্দুর দিকে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলেন।

অতঃপর আরও আট দিন কাটিল। চন্দ্রবর্মা কোনও প্রকার যুদ্ধোদ্যম না করিয়া কেবলমাত্র পথরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

ক্রমে দুর্গে খাদ্যদ্রব্য দুমূ্ল্য হইতে আরম্ভ করিল। নাগরিকদিগের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল।

এইরূপে আশায় আশঙ্কায় আরও একপক্ষ অতীত হইল। ফাল্গুন নিঃশেষ হইয়া আসিল।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। সেই বিট—সেই পীঠমর্দ, যে সোমদত্তার অনাবৃত যৌবনশ্রী দেখিয়া উন্মত্ত হইয়াছিল, সে আমি। তখন আমার নাম ছিল, চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা। ঘটোৎকচগুপ্তের ন্যায় আমার পিতাও একজন পরাক্রান্ত ভূস্বামী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর আমি স্বাধীন হইয়া রাজধানীতে রাজার সাহচর্যে নাগরিক-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঐশ্বর্যে বিলাসে কালযাপন করিতেছিলাম।

তীব্র আসবপান করিলে যে বিচারহীন বিবেকহীন মত্ততা জন্মে, সোমদত্তাকে দেখিয়া আমার সেই মত্ততা জন্মিয়াছিল। অবশ্য, বিবেকবুদ্ধি তৎপূর্বেই যে আমার অত্যন্ত অধিক ছিল তাহা নহে। চিরদিন আমার চিত্ত বল্গাশূন্য অশ্বের মতো শাসনে অনভ্যস্ত। কোনও বস্তু আত্মসাৎ করিতে—তা সে নারীই হউক বা ধনরত্নই হউক—নিজের ঐহিক সুবিধা ও সামর্থ্য ভিন্ন কোনও নিষেধ কখনও স্বীকার করি নাই। গুরুলঘুজ্ঞান কদাপি আমার বাসনার সামগ্রীকে দুষ্প্রাপ্য করিয়া তুলে নাই। যখন যাহা অভিলাষ করিয়াছি, ছলে-বলে যেমন করিয়া পারি তাহা গ্রহণ করিয়াছি।

চন্দ্রগুপ্ত যখন সোমদত্তাকে শ্যেনপক্ষীর মতো আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল, তখন বাধাপ্রাপ্ত প্রতিহত বাসনা দুর্বার আক্রোশে আমার বক্ষের মধ্যে গর্জন করিতে লাগিল। চন্দ্রগুপ্ত রাজা, আমি তাহার নর্মসহচর—বয়স্য; কিন্তু তথাপি

কোনও দিন তাহাকে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বা যোগ্যতর ভাবিতে পারি নাই। শ্যালকপ্রসাদে সে রাজা হইয়াছে; সুযোগ ঘটিলে আমিও কি হইতে পারিতাম না? বাহুবলে, রণশিক্ষায়, নীতি-কৌশলে, বংশগরিমায় আমি তাহার অপেক্ষা কোনও অংশে ন্যূন নহি। তবে কোন্ অধিকারে সে আমার ঈপ্সিত বস্তু কাড়িয়া লইল?

অন্য তিন জন রাজপ্রসাদলোভী চাটুকার, যাহারা সেদিন আমার নিগ্রহ দেখিয়াছিল, তাহারা আমার ক্রোধ ও অন্তর্দাহে ইন্ধন নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তামাশা-বিদ্রূপ-ইঙ্গিতের গোপন দংশনে আমাকে জর্জরিত করিয়া তুলিল। একদিন, চন্দ্রগুপ্ত তখনও সভায় আগমন করেন নাই, সভাস্থ পারিষদবর্গের মধ্যে নিম্নকণ্ঠে বাক্যালাপ হাস্য-পরিহাস চলিতেছিল, এমন সময় সিদ্ধপাল আমাকে লক্ষ্য করিয়া অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে কহিল, "চক্রায়ুধ, দেখ তো এই রত্নটি কেমন, কোশলের কোনও শ্রেষ্ঠী মহাবাজকে উপহার দিয়াছে। মহারাজ বলিয়াছেন, রত্নটি যদি অনাবিদ্ধ হয় তাহা হইলে স্বয়ং রাখিবেন, নচেৎ তোমাকে উহা দান করিবেন। দেখ তো, রত্নটি বজ্রসমুৎকীর্ণ কি না।"—বলিয়া একটি ক্ষুদ্র অতি নিকৃষ্টজাতীয় মণি আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিল।

সভারূঢ় ব্যক্তিগণ এই কদর্য ইঙ্গিতে কেহ দাঁত বাহির করিয়া, কেহ বা নিঃশব্দে হাসিল। সিংহাসনের পার্শ্বে চামরবাহিনী কিঙ্করী-গণ মুখে অঞ্চল দিয়া পরস্পরের প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ হানিল। আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম।

ক্রমে আমার কথা পাটলিপুত্র নগরে কাহারও অবিদিত রহিল না। আমি কোনও গোষ্ঠীসমবায় বা সমাপানকে পদার্পণ করিবা-মাত্র চোখে চোখে কটাক্ষে কটাক্ষে গুপ্ত ইঙ্গিতের স্রোত বহিয়া

যাইত। রাজসভায় রাজা আমাকে দেখিয়া ভ্রূকুটি করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমাকে রাজসভা ছাড়িতে হইল, লোক-সমাজও দুঃসহ হইয়া উঠিল। নিজ হর্ম্যতলে একাকী বসিয়া অন্তরের অগ্নিতে অহরহ দগ্ধ হইতে লাগিলাম।

এই সময় সমুদ্রোচ্ছ্বাসতুল্য অভিযান পাটলিপুত্রের দুর্গতটে আসিয়া প্রহত হইল। আমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধের সময় আমার ডাক পড়িল। মহাবলাধিকৃত বিরোধবর্মা আমাকে শতরক্ষীর অধিনায়ক করিয়া গোতমদ্বার নামক দুর্গের পশ্চিম তোরণ রক্ষার ভার দিলেন।

কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রহীন রাত্রি। আমি অভ্যাসমত প্রাকারের উপর একাকী পাদচারণ করিতেছিলাম। অবসন্ন বসন্তের শেষ পুষ্প চম্পা চারিদিকে তীব্র বাস বিকীর্ণ করিতেছিল।

বাহিরে শত্রুশিবিরে দীপসকল প্রায় নিবিয়া গিয়াছে—দূরে দূরে দুই একটা জ্বলিতেছে। নিম্নে পরিখার জল স্থির কৃষ্ণদর্পণের মতো পড়িয়া আছে, তাহাতে আকাশস্থ নক্ষত্রপুঞ্জের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। নগরের মধ্যে শব্দ নাই, আলোক নাই, গৃহে গৃহে দ্বার রুদ্ধ, দীপ নির্বাপিত। রাজপথও আলোকহীন। তামসী রাত্রির গহন অন্ধকার যেন বিরাট পক্ষ দিয়া চরাচর আচ্ছন্ন কবিয়া রাখিয়াছে।

পাটলিপুত্র সুপ্ত, অরাতি-সৈন্যও সুপ্ত। কিন্তু নগরদ্বারের প্রহরীরা জাগ্রত। তোরণের উপর নিঃশব্দে রক্ষীগণ প্রহরা দিতেছে। প্রাকারের উপর স্থানে স্থানে সতর্ক রক্ষী নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান। শত্রু পাছে অন্ধকারে গা ঢাকিয়া অতর্কিতে প্রাকার-লঙ্ঘনের চেষ্টা করে, এইজন্য রাত্রিতে পাহারা দ্বিগুণ সাবধান থাকে।

রাজপুরী হইতে বেহাগ-রাগিণীতে মধ্যরাত্রি বিজ্ঞাপিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে পাটলিপুত্রের দশ দ্বারের প্রহরী দুন্দুভি বাজাইয়া উচ্চ-কণ্ঠে প্রহর হাঁকিল। নৈশ নীরবতা ক্ষণকালের জন্য বিক্ষুব্ধ করিয়া এই উচ্চরোল ক্রমে ক্রমে মিলাইয়া গেল; নগরী যেন শত্রুকে জানাইয়া দিল—"সাবধান! আমি জাগিয়া আছি।"

একাকী পাদচারণ করিতে করিতে নানা চিন্তা মনে উদয় হইতেছিল। কিসের জন্য এই রাত্রি দ্বিপ্রহরে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া নিশাচরের মতো ঘুরিয়া বেড়াইতেছি? পাটলিপুত্র দুর্গ রক্ষা করিয়া আমার লাভ কি? যাহার রাজ্য, সে তো কামিনীর কণ্ঠলগ্ন হইয়া সুখে নিদ্রা যাইতেছে। পাটলিপুত্র যদি চন্দ্রবর্মা অধিকার করে, তবে কাহার কি ক্ষতি? দুর্গের মধ্যে অন্নাভাবের সঙ্গে সঙ্গে রোগ দেখা দিয়াছে, মানুষ না খাইয়া মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। বাহির হইতে খাদ্য আনয়নের উপায় নাই। শুধু বাত্রির অন্ধকারে লুকাইয়া জালিকেরা নদী হইতে প্রত্যহ কিছু কিছু মৎস্য সংগ্রহ করিতেছে। কিন্তু তাহাই বা কতটুকু?—নগবীর ক্ষুধা তাহাতে মিটে না। এভাবে আর কত দিন চলিবে? অবশেষে এক দিন বশ্যতা স্বীকার করিতেই হইবে; তবে অনর্থক এ ক্লেশভোগ কেন? সমগ্র দেশ যখন চন্দ্রবর্মার চরণে আত্ম-সমর্পণ কবিয়াছে, তখন পাটলিপুত্র নগর একা কয়দিন টিঁকিয়া থাকিবে?

চন্দ্রগুপ্ত যদি রাজ্যাধিকারের যোগ্য হইত, তবে সে নিজে আসিয়া নিজের রাজ্য রক্ষা করিত। আমি কেন এই অপদার্থ রাজার রাজ্যরক্ষার সাহায্য করিতেছি? সে আমার কি করিয়াছে? আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছে, আমাকে জগতের সম্মুখে হাস্যাস্পদ করিয়াছে। সোমদত্তা! সেই দেবভোগ্যা অপ্সরা! বুঝি পুরুষের লালসা-পরিতৃপ্তির জন্যই তাহার অনুপম দেহ সৃষ্ট

হইয়াছিল! তাহাকে না পাইলে আমার এই অনির্বাণ তৃষ্ণা মিটিবে কি?—সে এখন চন্দ্রগুপ্তের অঙ্কশায়িনী। চন্দ্রগুপ্ত কি তাহাকে বিবাহ করিয়াছে? করুক না করুক, সোমদত্তাকে আমার চাই; যেমন করিয়া পারি, যে উপায়ে পারি, সোমদত্তাকে আমি কাড়িয়া লইব। পারিব না? নারীর মন, কত দিন এক পুরুষে আসক্ত থাকিবে? তখন চন্দ্রগুপ্ত! তোমাকে জগতের কাছে হাস্যাস্পদ করিব। সেই আমার লাঞ্ছনার যোগ্য প্রতিশোধ হইবে।

এই সর্বগ্রাসী চিন্তা মনকে এমনই আচ্ছন্ন করিয়াছিল যে, অজ্ঞাতসারে গোতম-দ্বার হইতে অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। প্রাকারেব এই অংশ বাত্রিকালে স্বভাবতঃই অতিশয় নির্জন। এই স্থানের দুর্গ-প্রাচীর এতই দুরধিগম্য যে, প্রহরী-স্থাপনেরও প্রয়োজন হয় নাই।

ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ফিরিব ভাবিতেছি, এমন সময় সহসা চোখে পড়িল, সম্মুখে কিছুদূরে প্রাকারের প্রান্তস্থিত এক কণ্টকগুল্মের অন্তরালে দীপ জ্বলিতেছে। পাছে বাহিব হইতে শত্রু দুর্গ-প্রাচীরে আরোহণ করে, এ জন্য প্রাচীরগাত্রে সর্বত্র কাঁটাগাছ রোপিত থাকিত। কখনও কখনও এই সকল কাঁটাগাছ প্রাকাব-শীর্ষ ছাড়াইয়া মাথা তুলিত। সেইরূপ দুইটি ঘন-পল্লবিত কণ্টক-তরুর মধ্যস্থিত ঝোপের ভিতব প্রদীপ জ্বলিতেছে দেখিলাম। প্রদীপ কখনও উঠিতেছে, কখনও মণ্ডলাকারে আবর্তিত হইতেছে। কেহ যেন একান্তে দাঁড়াইয়া কোন অদৃশ্য দেবতাব আরতি করিতেছে।

পাদুকা খুলিয়া ফেলিয়া নিঃশব্দে কটি হইতে তরবারি বাহির করিয়া হস্তে লইলাম। তারপর অতি সন্তর্পণে সেই সঞ্চরমান দীপশিখার দিকে অগ্রসর হইলাম।

কণ্টকগুল্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তন্মধ্যে এক নারী দাঁড়াইয়া পরিখার অপর পারে অনন্য স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে এবং প্রদীপ ইতস্ততঃ আন্দোলিত করিতেছে। পশ্চাৎ হইতে তাহার মুখ সম্পূর্ণ দেখিতে পাইলাম না, শুধু চোখে পড়িল, তাহার নবমল্লিকাবেষ্টিত কুণ্ডলিত কবরীভার, তন্মধ্যে দুইটি পদ্মরাগমণি সর্প-চক্ষুর মতো জ্বলিতেছে। বুঝিতে বিলম্ব হইল না, এ রমণী গুপ্তচর; আলোকের ইঙ্গিতে শত্রুর নিকট সংবাদ প্রেরণ করিতেছে।

লঘুহস্তে তাহার স্কন্ধ স্পর্শ করিলাম। সশব্দ নিশ্বাস টানিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে রমণী ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন তাহারই হস্তধৃত মৃৎপ্রদীপের আলোকে তাহাকে চিনিলাম।

সোমদত্তা!

কম্পিত দীপশিখার আলোক তাহার ত্রাসবিকৃত মুখের উপর পড়িল। চক্ষুর সুবৃহৎ কৃষ্ণতারকা আরও বৃহৎ দেখাইল। মুহূর্তের জন্য আমার মনে সন্দেহ জন্মিল, এ কি সত্যই সোমদত্তা, না আমার দৃষ্টিবিভ্রম? যে চিন্তা অহরহ আমার অন্তরকে গ্রাস করিয়া আছে, সেই চিন্তাব বস্তু কি মূর্তি ধরিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল? কিন্তু এ ভ্রম অল্পকালেব জন্য, আকস্মিক আঘাতে বিপন্ন বুদ্ধি পরক্ষণেই ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম, সোমদত্তার হস্তে প্রদীপ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, এখনই পড়িয়া নিবিয়া যাইবে। আমি তরবারি কোষবদ্ধ করিয়া তাহার হাত হইতে প্রদীপ লইলাম,—তাহার মুখেব সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া মৃদুহাস্যে বলিলাম, "এ কি! পরম-ভট্টারিকা মহাদেবী সোমদত্তা!"

সোমদত্তা ভয়সূচক অস্ফুটধ্বনি কবিয়া নিজ বক্ষে হস্তার্পণ করিল। পরক্ষণেই ছুরির একটা ঝলক এবং সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণাগ্র অস্ত্র আমার বস্ত্রাবৃত লৌহজালিকের ব্যবধানপথে বক্ষের চর্ম স্পর্শ

করিল। ভিতরে লৌহজালিক না থাকিলে সোমদত্তার হস্তে সে দিন আমার প্রাণ যাইত। আমি ক্ষিপ্রহস্তে ছুরিকা কাড়িয়া লইয়া নিজ কটিতে রাখিলাম, তারপর সবলে দুই বাহু দিয়া তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলাম। তাহার কর্ণে কহিলাম, "সোমদত্তা, কুহকিনী, আজ তোমাকে পাইয়াছি!"

তৈলপ্রদীপ মাটিতে পড়িয়া নিবিয়া গেল।

জালবদ্ধা ব্যাঘ্রীর মতো সোমদত্তা আমার বাহুমধ্যে যুদ্ধ করিতে লাগিল, নখ দিয়া আমার মুখ ছিঁড়িয়া দিল। আমি আরও জোরে তাহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "ভালো, ভালো। তোমার নখর-ক্ষত কাল চন্দ্রগুপ্তকে দেখাইব!"

সহসা সোমদত্তার দেহ শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়িল; অন্ধকারে ভাবিলাম, বুঝি মূর্ছা গিয়াছে। তারপর তাহার দ্রুত কম্পনে ও কণ্ঠোত্থিত নিরুদ্ধ শব্দে বুঝিলাম, মূর্ছা নহে—সোমদত্তা কাঁদিতেছে। কাঁদুক—কামিনীব ক্রন্দন আমার জীবনে এই প্রথম নহে। প্রথম প্রথম এমনই কাঁদে বটে। আমি তাহাকে কাঁদিতে দিলাম।

কিছুক্ষণ ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিবার পব সোমদত্তা সোজা হইয়া দাঁড়াইল; অশ্রুবিকৃত কণ্ঠে কহিল, "তুমি কে? কেন আমাকে ধরিয়াছ? শীঘ্র ছাড়িয়া দাও!"

আমি আলিঙ্গন শিথিল করিলাম না, বলিলাম, "আমি কে শুনিবে? আমি চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা—তোমার চন্দ্রগুপ্তের বয়স্য, উপস্থিত দুর্গ-তোরণের রক্ষক। আরও অধিক পরিচয় যদি চাও তো বলি, আমি সোমদত্তার রূপের মধুকর। যে দিন তটিনীতটে অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলে, ছলনাময়ী, সেই দিন হইতে তোমার রূপযৌবনের আরাধনা করিতেছি!"

অনুভব করিলাম, সোমদত্তা শিহরিয়া উঠিল। আমি বলিলাম, “চিনিয়াছ দেখিতেছি। হাঁ, আমি সেই বিট, যে স্বর্গের পারিজাত দেখিয়া লুব্ধ হইয়াছিল।”

সোমদত্তা কহিল, “পাপিষ্ঠ, আমাকে ছাড়িয়া দাও, নচেৎ রাজ-আদেশে তোমার মুণ্ড যাইবে।”

আমি হাসিয়া বলিলাম, “পাপিষ্ঠা, তোমাকে ছাড়িব না। ছাড়িয়া দিলে পট্টমহাদেবীর আদেশে আমার মুণ্ড যাইতে পারে। তুমি নিশীথ সময়ে রাজপুরী ছাড়িয়া কি জন্য বাহিরে আসিয়াছ? প্রাকারের নিভৃত স্থানে প্রদীপ লইয়া কি করিতেছিলে?”

কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া সোমদত্তা উত্তর করিল, “আমি রাজার অনুমতি লইয়া পুরীর বাহিরে আসিয়াছি।”

ব্যঙ্গ করিয়া বলিলাম, “চন্দ্রগুপ্ত বোধ করি তোমাকে শত্রুর নিকটে সংকেত প্রেরণ করিবার জন্য পাঠাইয়াছে?”

সোমদত্তা আবার শিহরিল। বলিল, “আমি বৌদ্ধ সেবাশ্রমে আর্তের চিকিৎসা করিতে প্রত্যহ আসি—রাজার অনুমতি আছে। আজিও আসিয়াছি।”

‘প্রাকারের উপর এতক্ষণ কোন্ আর্তের চিকিৎসা করিতেছিলে?’

“প্রাকারের উপর আহত কেহ আছে কি না দেখিতে আসিয়াছিলাম।”

“ভালো, আজ রাত্রিতে আমার নিকট বন্দিনী থাক, কাল চন্দ্রগুপ্তকে এই কথা বলিও। প্রহরী ডাকি?”

সোমদত্তা নীরব, মুখে কথা নাই।

আমি পুনরায় কহিলাম, “কি বল? প্রহরী ডাকি?”

অবরুদ্ধ কণ্ঠে সোমদত্তা কহিল, “তুমি যাহা চাও দিব—আমাকে ছাড়িয়া দাও।”

আমি বলিলাম, "যাহা চাই, তাহা এখন জোর করিয়া লইব। তোমার দানের অপেক্ষা রাখি না।"

ভীত অস্পষ্ট কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাও?"

"তোমাকে।"

সোমদত্তা পুনরায় আমার আলিঙ্গন-মুক্ত হইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল। শেষে বিফল হইয়া আমার বক্ষের উপর সবলে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিল, "আমাকে ছাড়িয়া দাও! ছাড়িয়া দাও! ছাড়িয়া দাও! আমি রাজমহিষী, আমার উপরে অত্যাচার করিলে তুমি শূলে যাইবে।"

আমি বলিলাম, "তুমি চন্দ্রবর্মার চর,—রাজাকে রূপের কুহকে ভুলাইয়া রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছ। শূল তো দূরের কথা, তোমার উপর অত্যাচার করিলে কুমারদেবী আমাকে পুরস্কৃত করিবেন। মনে রাখিও, তুমি তাঁর সপত্নী।"

সোমদত্তা কাঁদিয়া উঠিল, "দয়া কর, আমি রাজার স্ত্রী।"

"তুমি গুপ্তচর।"

তখন সোমদত্তা আমার বক্ষেব উপব নিঃসহায়ে মাথা বাখিয়া কাঁদিতে লাগিল। এত কাঁদিল যে, বোধ করি পাষাণও দ্রব হইয়া যাইত। কিন্তু আমি লোভে নিষ্ঠুর—তাহার অশ্রু আমাকে দ্রব করিতে পারিল না।

কাঁদিতে কাঁদিতে সোমদত্তা জিজ্ঞাসা করিল, "দয়া করিবে না?"

আমি বলিলাম, "এইটুকু দয়া করিতে পারি, আমি যাহা চাই তাহা স্বেচ্ছায় যদি দাও, তবে চন্দ্রগুপ্ত কিছু জানিবে না।"

ব্যাকুল হইয়া সোমদত্তা কহিল, "আমি সেরূপ স্ত্রীলোক নহি। চন্দ্রগুপ্ত আমার স্বামী, আমি তাঁহাকে ভালবাসি। শুন, আমি চন্দ্রবর্মার গুপ্তচর এ কথা সত্য, তাঁহারই কার্যসিদ্ধির জন্য মগধে

আসিয়াছিলাম। কিন্তু তখন জানিতাম না—ভালবাসার স্বাদ পাই নাই। আজ আমি স্বামীর রাজ্য পরের হস্তে তুলিয়া দিবার যত্ন করিতেছি, কেন করিতেছি তাহা তুমি বুঝিবে না। কিন্তু স্বরূপ বলিতেছি, আমি তাঁহাকে ভালবাসি, আমার চোখে তিনি ভিন্ন অন্য পুরুষ নাই। তুমি আমাকে দয়া কর, মুক্তি দাও। আমি শপথ করিতেছি, চন্দ্রবর্মা পাটলিপুত্র অধিকার করিলে আমি তোমাকে কাশী, কোশল, চম্পা, গৌড়—যে রাজ্য চাও তাহার সিংহাসনে বসাইব। চন্দ্রবর্মা আমাকে স্নেহ করেন, আমার যাচ্ঞা কখনো নিষ্ফল হইবে না।"

"কিন্তু চন্দ্রবর্মা যদি পাটলিপুত্র অধিকার করিতে না পারেন ?"

"এমন কখনো হইতে পারে না।"

"বুঝিলাম। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যদি চন্দ্রগুপ্তকে সত্যিই ভালবাস, তবে তাহার সর্বনাশ করিতেছ কেন ?"

কিছুক্ষণ নীবব থাকিয়া সোমদত্তা বলিল, "চন্দ্রবর্মা আমার পিতা।"

ঘোব বিস্ময়ে কহিলাম, "তুমি চন্দ্রবর্মার কন্যা ?"

অধোমুখে সোমদত্তা কহিল, "হাঁ, কিন্তু বারাঙ্গনার গর্ভজাতা।"

"বুঝিয়াছি।"

"তুমি নরাধম, কিছু বুঝ নাই। আমি শৈশব হইতে রাজ-অন্তঃপুরে পালিতা।"

"ভালো, তাহাও বুঝিলাম। বুঝিলাম যে, পিতার জন্য তুমি স্বামীর সর্বনাশ করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমার কথাও তুমি বুঝিয়া লও। আমি গৌড় চাহি না, চম্পা চাহি না, কাশী-কোশল কিছুই চাহি না—আমি তোমাকে চাই। অস্বীকার করিলে কোনও ফল

হইবে না,—উপরন্তু চন্দ্রগুপ্ত তোমার এই অভিসার-কথা জানিতে পারিবে।"

সোমদত্তা কম্পিতস্বরে কহিল, "ইচ্ছা হয়, আমাকে হত্যা করিয়া ঐ পরিখার জলে ফেলিয়া দাও, আমি কোন কথা কহিব না। কিন্তু মহারাজকে এ কথা বলিও না। পুরুষের মন সর্বদা সন্দিগ্ধ, তিনি আমার প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝিবেন না, আমাকে অবিশ্বাস করিবেন। স্বীকার কর, বলিবে না ?"

নারী-চরিত্র কে বুঝিবে ? কহিলাম, "উত্তম, বলিব না। কিন্তু আমার পুরস্কার ?"

সোমদত্তা নীরব।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমার পুরস্কার ?"

তথাপি সোমদত্তা মৌন।

আমি তখন ক্ষিপ্ত। নির্মম পীড়নে তাহার দেহলতা বিমথিত করিয়া অধরে চুম্বন করিলাম।

"বলিলাম, "সোমদত্তা, তোমার রূপের আগুনে আজ আপনাকে আহুতি দিলাম।"

সোমদত্তা যেন মর্মতন্তু ছিঁড়িয়া কথা কহিল, বলিল, "শুধু তুমি নহ, তুমি, আমি, চন্দ্রগুপ্ত, মগধ—সব এই আগুনে পুড়িয়া ছাই হইবে।"

নগরের কেন্দ্রস্থলে প্রায় পাদক্রোশ ভূমির উপর মগধের প্রাচীন রাজপুরী। এই পাদক্রোশ ভূমি উচ্চ পাষাণ-প্রাচীর বেষ্টিত। পূর্বদিকে প্রশস্ত রাজপথের উপর কারুকার্যশোভিত উচ্চ পাষাণ তোরণ। এই তোরণ উত্তীর্ণ হইয়া প্রথমেই বহুস্তম্ভযুক্ত বিচিত্র দ্বিতল মন্ত্রগৃহ। তাহার পশ্চাতে মহলের পর মহল, প্রাসাদের পর

প্রাসাদ,—কোনটি কোষাগার, কোনটি অলংকারগৃহ, কোনটি দেবগৃহ, কোনটি চিত্রভবন। মধ্যে কুঞ্জবেষ্টিত কমল-সরোবর—তাহাতে সারস মরাল প্রভৃতি পক্ষী ও বহুবর্ণের মৎস্য ক্রীড়া করিতেছে।

সকলের পশ্চাতে শীর্ণ অথচ জলপূর্ণ পরিখার গণ্ডীনিবদ্ধ মগধেশ্বরের অন্তঃপুর। সেতু পার হইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হয়। সেতুমুখে কঞ্চুকীসেনা অহোরাত্র পাহারা দিতেছে। ভিতরে সুন্দর কারুশিল্পমণ্ডিত উচ্চশীর্ষ সৌধ সকল পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যেন ইন্দ্রভুবন রচনা করিয়াছে। এখানে সকল গৃহই ত্রিতল, প্রথম তল শ্বেত-প্রস্তরে রচিত, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তল দারুনির্মিত।

এই পুরী চন্দ্রগুপ্তের নির্মিত নহে, মৌর্যকালীন প্রাচীন রাজ-ভবন। রাজ্যজয়ের সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত ইহা অধিকার করিয়াছিলেন। অধিকার করিয়াই রাজপুরীর যাহা সারবস্তু সেই মোহন-গৃহ সন্ধান করিয়াছিলেন, কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাহা আবিষ্কার কবিতে পাবেন নাই। মোহনগৃহ রাজভবনের একটি গোপন কক্ষ, দেখিতে অন্যান্য সাধারণ কক্ষের মতোই, কিন্তু ইহার প্রাচীর ও হর্ম্যতলে নানা গুপ্তদ্বার থাকিত। সেই গুপ্তদ্বার দিয়া ভূ-নিম্নস্থ সুড়ঙ্গপথে পুরীব বাহিরে যাওয়া যাইত; এমন কি ঘোর বিপদ-আপদের সময় দুর্গের বাহিরে পলায়ন করাও চলিত। এই মোহন-গৃহ প্রত্যেক রাজপুরীর একটি অপরিহার্য অঙ্গ ছিল; স্বয়ং রাজা এবং পট্টমহিষী ভিন্ন ইহার সন্ধান আর কাহারও জানা থাকিত না। মৃত্যুকালে রাজা পুত্রকে বলিয়া যাইতেন।

এই রাজপ্রাসাদে পূর্ববর্ণিত ঘটনার পরদিন প্রভাতে আমি কিছু গোপন অভিসন্ধি লইয়া উপস্থিত হইলাম। সম্মুখেই মন্ত্রগৃহ,—বহুজনাকীর্ণ। সচিব, সভাসদ্, সেনানী, শ্রেষ্ঠী, বয়স্য, বিদূষক—

সকলেই উপস্থিত ; সকলের মুখেই দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠার চিহ্ন। চারিদিক্ হইতে তাহাদের মৃদুজল্পিত গুঞ্জনধ্বনি উঠিতেছে। সভার কেন্দ্রস্থলে রত্নসিংহাসনে বসিয়া কেবল মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত নির্লিপ্ত নির্বিকার। আমি সভায় প্রবেশ করিতে চন্দ্রগুপ্ত একবার চক্ষু তুলিয়া আমার দিকে চাহিল—মোহাচ্ছন্ন স্বপ্নাবিষ্ট ভাব—যেন কিছুতেই কিছু আসে যায় না। আমি সম্ভ্রম দেখাইয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিলাম, চন্দ্রগুপ্ত ঈষৎ বিরক্তিসূচক ভ্রূকুটি করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল। আমার হাসি আসিল, মনে মনে বলিলাম, "চন্দ্রগুপ্ত ! যদি জানিতে !···"

রাজ-সম্মুখ হইতে অপসৃত হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে এক স্তম্ভের আড়ালে সন্নিধাতার সহিত দেখা হইল। সর্বদা রাজ-সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহার পরিচর্যা করা সন্নিধাতার কার্য। নানা কারণে এই সন্নিধাতার সহিত আমার কিছু প্রণয় ছিল ; অনেকবার রাজ-প্রাসাদের অনেক গূঢ় সংবাদ তাহার নিকট হইতে পাইয়াছি। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বল্লভ, খবর কি ?"

বল্লভ বলিল, "নূতন খবর কিছুই নাই। মহারাজ আজ পত্রচ্ছেদ্যকালে বলিতেছিলেন যে, মোহনগৃহের সন্ধান জানা থাকিলে এ পাপ রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেন।"

আমি বলিলাম, "সংসারে এত বৈরাগ্য কেন ?"

বল্লভ চোখ টিপিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "সংসারের সকল বস্তুতে নয়!—সে যাক্, তোমায় বহুদিন দেখি নাই, সভায় আস না কেন ?"

আমি বলিলাম, "দিনরাত গোতমদ্বারে পাহারা—সময় পাই না।—বিরোধবর্মা কোথায় বলিতে পার ? সভায় তো তাঁহাকে দেখিতেছি না।"

বল্লভ বলিল, "মহাবলাধিকৃত উপরে আছেন, সান্ধিবিগ্রহিকের সঙ্গে কি পরামর্শ হইতেছে।"

"আমারও কিছু পরামর্শ আছে"—বলিয়া সোপান অতিবাহিত করিয়া আমি উপরে গেলাম।

বিরোধবর্মা তখন গুপ্তসদস্যগৃহে বসিয়া সান্ধিবিগ্রহিকের সহিত চুপি চুপি কথা কহিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া উভয়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে চাহিলেন। আমি কোনও প্রকার ভণিতা না করিয়া বলিলাম, "এরূপভাবে কতদিন চলিবে? দুর্গে খাদ্য নাই, পানীয় নাই; এক দীনারেব কমে আঢ়ক পরিমাণ মাধ্বী পাওয়া যায় না। ঘরে ঘরে লোক না খাইয়া মরিতে আরম্ভ করিয়াছে। যুদ্ধে মরিত কোন কথা ছিল না; কিন্তু শত্রুকে বিতাড়িত করিবার কোন চেষ্টাই নাই। কেবলমাত্র দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি ফল দর্শিবে? নাগরিকগণ নানা কথা বলিতেছে—দুর্গরক্ষীরাও সন্তুষ্ট নয়।"

সান্ধিবিগ্রহিক জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহারা কি বলে?"

আমি বলিলাম, "কাল সন্ধ্যায় চণ্ডপালের মদিরাগৃহে গিয়াছিলাম। সেখানে শুনিলাম, অনেকেই বলাবলি করিতেছে—চন্দ্রবর্মার দিগ্বিজয়ী সেনার বিরুদ্ধে শূন্য উদর লইয়া দুর্গরক্ষার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। দুর্গ একদিন তাহারা অধিকার করিবেই, সুতরাং বাধা না দিয়া নির্বিবাদে আসিতে দেওয়াই সুবুদ্ধি—তাহাতে তাহাদেব নিকট সদ্ব্যবহাব প্রত্যাশা করা যাইতে পারে।"

সান্ধিবিগ্রহিক ও মহাবলাধিকৃত দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন। বিরোধবর্মা কহিলেন, "চন্দ্রবর্মা পাটলিপুত্র অধিকার করিতে পারিবে না, তাহার দিগ্বিজয়যাত্রা এইখানেই শেষ হইবে।"

আমি বলিলাম, "কিন্তু—"

বাধা দিয়া বিরোধবর্মা বলিলেন, "ইহার মধ্যে কিন্তু নাই। জানিয়া রাখ, আজ হইতে দশ দিনের মধ্যে দিগ্বিজয়ী চন্দ্রবর্মা লাঙ্গুল উচ্চে তুলিয়া মগধ হইতে পলায়ন করিবে। ইচ্ছা হয়, তুমি তার পশ্চাদ্ধাবন করিও।"

ভিতরে কিছু কথা আছে বুঝিলাম। কি কথা জানিবার জন্য পুনশ্চ বলিলাম, "কেমন করিয়া এই অঘটন সম্ভব হইবে জানি না। দশ দিনের মধ্যে নগর শ্মশানে পরিণত হইবে। তখন চন্দ্রবর্মা রহিল কি পলাইল, কে দেখিতে যাইবে?"

বিরোধবর্মা কহিলেন, "খাদ্যের আয়োজন হইয়াছে, কল্য হইতে সকলে প্রচুর খাদ্য পাইবে।"

আমি বিস্মিতভাবে তাঁহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলাম। ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করি, কি ভাবে কোথা হইতে খাদ্য আসিবে। কিন্তু প্রশ্ন করা সুবিবেচনা হইবে না বুঝিয়া বলিলাম, "কিন্তু খাদ্য পাইলেই কি চন্দ্রবর্মাকে বিতাড়িত করা যাইবে?"

বিরোধবর্মা বলিলেন, "বলিয়াছি, দশ দিনের মধ্যে চন্দ্রবর্মাকে তাড়াইব!"

"কিন্তু এই দশ দিন প্রজাদের কি বলিয়া বুঝাইয়া রাখিবেন? প্রজা ও রক্ষিসৈন্য মিলিয়া যদি মাৎস্যন্যায় করে?"

"মাৎস্যন্যায়!"—বিরোধবর্মা গর্জিয়া উঠিলেন,—"চক্রায়ুধ, যে যোদ্ধা শত্রুকে দুর্গসমর্পণের কথা চিন্তা করিবে তাহাকে শূলে দিব, যে প্রজা মাৎস্যন্যায়ের কথা উচ্চারণ করিবে তাহাকে হাত-পা বাঁধিয়া পরিখার কুম্ভীরের মুখে ফেলিয়া দিব। মাৎস্যন্যায়!—এখনো আমি বাঁচিয়া আছি।" ঈষৎ শান্ত হইয়া বলিলেন, "তুমি যাও, যে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহাকে বলিও, অন্তরীক্ষপথে বার্তা আসিয়াছে, চন্দ্রবর্মার উচ্ছেদ হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই।"

অন্তরীক্ষ-পথে! আমি উঠিলাম। উভয়কে প্রণাম করিয়া বাহির হইতেছি, সান্ধিবিগ্রহিক আমাকে ফিরিয়া ডাকিলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন, "চক্রায়ুধ! যাহা শুনিলে, তাহা হইতে যদি কিছু অনুমান করিয়া থাক, তাহা নিজ অন্তরে রাখিও। মন্ত্রভেদে রাজ্যের সর্বনাশ হয়।"

"যথা আজ্ঞা"—বলিয়া মনে মনে হাসিয়া আমি বিদায় লইলাম।

সেই রাত্রিতে মধ্যযাম ঘোষিত হইবার পর সোমদত্তা আবার আসিল। গতরাত্রির সংকেতস্থানে আমি পূর্ব হইতেই উপস্থিত ছিলাম, প্রদীপ হস্তে ধরিয়া ভুবনমোহিনীর ন্যায় আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। আমি দুই বাহু প্রসারিত করিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম। সোমদত্তা ভুবনমোহন হাসি হাসিয়া আমার আলিঙ্গনে আত্মসমর্পণ কবিল।

এক রাত্রির মধ্যে কি পরিবর্তন! নারীর মন এমনই বটে,—কাল যে ধর্মের জন্য যুদ্ধ কয়িতেছিল, আজ সে নাগরের প্রেমে পাগল! আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, তাই বিস্মিত হইলাম না। স্ত্রীজাতি যখন দেখে কুল গিয়াছে, তখন প্রাণপণে নাগরকে ধরিয়া থাকে; দু'কুল হারাইয়া ইতোনষ্ট-স্ততোভ্রষ্ট হইতে চাহে না।

আমি বলিলাম, "সোমদত্তা, চন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন অন্য পুরুষ পৃথিবীতে আছে কি?"

সোমদত্তা দুই মৃণালভুজে আমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া মুখের অত্যন্ত নিকটে মুখ আনিয়া মৃদু সলজ্জ স্বরে কহিল, "আগে জানিতাম না, এখন বুঝিয়াছি, তুমি ভিন্ন জগতে অন্য পুরুষ নাই।"

সোমদত্তার কথা, তাহার স্পর্শ, তাহার দেহসৌরভ আমার সর্বাঙ্গ ঘিরিয়া হর্ষের প্লাবন আনিয়া দিল। অনির্বচনীয় সুখের মাদকতা মস্তিষ্ককে যেন অবশ করিয়া ফেলিল। সৃষ্টির আরম্ভ হইতে এমনই করিয়াই বুঝি নারী পুরুষকে বশ করিয়া রাখিয়াছে!

আমি বলিলাম, "সোমদত্তা, প্রিয়তমে, তোমাকে আমি সমগ্রভাবে, অনন্যভাবে চাই! রাত্রিতে চোরের মতো লুকাইয়া এই ক্ষণিকের মিলন—ইহাতে আমাব হৃদয় পূর্ণ হইতেছে না!"

সোমদত্তা আমাব স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া দীর্ঘশ্বাস মোচন কবিয়া বলিল, "তাহা কি করিয়া হইবে, প্রাণাধিক? আমি যে বাজপুরীর পুবস্ত্রী—চন্দ্রগুপ্তের বনিতা।"

বহুক্ষণ দুইজনে নীরব বহিলাম। সোমদত্তাব মতো নারীকে যে পায় নাই, সে জানে না, তাহাব জন্য পুরুষেব মনে কি তীব্র—কি দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগিতে পারে। আমিও যতদিন তাহাকে দূর হইতে কামনা কবিয়াছিলাম, ততদিন তাহাব এই দুর্নিবাব শক্তি অনুভব করি নাই। সোমদত্তাকে লাভ কবিবাব বাসনা অপেক্ষা তাহাকে একান্তে নিজস্ব কবিয়া ভোগ কবিবাব আকাঙ্ক্ষা শতগুণ প্রবল! তাহাব মধ্যে এমন একটা আকর্ষণ আছে, যাহা তাহাব অলৌকিক যৌবনশ্রীবও অতীত, যাহা ভোগে অবসাদ আনে না, ঘৃতাহুতিব ন্যায় কামনাব অগ্নিকে আবও বাড়াইযা তুলে। সোমদত্তার ন্যায় নাবীব জন্য পুরুষ ইহকাল পরকাল অকাতবে বিসর্জন করিতে পাবে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয, সৃষ্টি বসাতলে পাঠাইতে তিলমাত্র দ্বিধা কবে না।

"শত্রুর নিকট কাল কি সংকেত পাঠাইতেছিলে?"

সোমদত্তা আমাব স্কন্ধ হইতে মস্তক তুলিল। আমাব মুখের উপর দুই চক্ষু পাতিয়া যেন অন্তরের অন্তস্তল পর্যন্ত অন্বেষণ করিয়া

লইল। সেখানে কি দেখিল জানি না, বলিল, "দুর্গের দুই একটা কথা জানাইতেছিলাম।"

"তাহা না বলিলেও বুঝিয়াছি। কি কথা?"

"নগরে খাদ্য নাই, এই সংবাদ দিতেছিলাম।"

আমি বলিলাম, "ভুল সংবাদ দিয়াছ—কাল প্রভাত হইতে নগরে আর অন্নাভাব থাকিবে না।"

সোমদত্তা চমকিত হইয়া বলিল, "সে কি! কোথা হইতে খাদ্য আসিবে?"

আমি বলিলাম, "তাহা জানি না। বোধ হয় কোনও সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেই পথে বাহির হইতে খাদ্যাদি আসিবে।"

"সুড়ঙ্গ? কোথায় সুড়ঙ্গ?"

"তাহা কি করিয়া জানিব? এ আমার অনুমান মাত্র। কিন্তু নিশ্চিত বলিতেছি, নগরে আর দুর্ভিক্ষ থাকিবে না, সে আয়োজন হইয়াছে। শুধু তাই নয়, শীঘ্রই চন্দ্রবর্মা বাহির হইতে আক্রান্ত হইবেন—বোধ হয় বৈশালী হইতে সৈন্য আসিতেছে।"

"সত্য বলিতেছ? আমাকে প্রতারণা করিতেছ না?"

"সত্য বলিতেছি, আজ বিরোধবর্মার মুখে এ কথা শুনিয়াছি।"

সোমদত্তা ললাটে করাঘাত করিল; বলিল, "হায়! কাল এ কথা শুনি নাই কেন? শুনিলে প্রাণ দিতাম, তবু..."

সোমদত্তা বিদ্যুদগ্নিপূর্ণ দুই চক্ষু আমার দিকে ফিরাইল। দীর্ঘকাল মৌন থাকিয়া শেষে বলিল, "যাহা হইবার হইয়াছে, ললাট-লিখন কে খণ্ডাইবে? বেশ্যা-কন্যার বুঝি ইহাই প্রাক্তন!"

আমি বাহু দ্বারা তাহার কটিবেষ্টন করিয়া সোহাগে গদ্গদ

স্বরে কহিলাম, "সোমদত্তা, প্রেয়সী, কেন বৃথা খেদ করিতেছ? তুমি আমার। চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা তোমার জন্য অগ্নিতে প্রবেশ করিবে, জলে ঝাঁপ দিবে। চন্দ্রগুপ্তের কাল পূর্ণ হইয়াছে, তোমার জন্য আমি তার সর্বনাশ করিব।"

"তুমিও চন্দ্রগুপ্তের সর্বনাশ করিবে?"

"করিব। তুমি পার, আর আমি পারি না? চন্দ্রগুপ্ত আমার কে?"

"সখা!"

"সখা নয়। আমি তার প্রমোদের সহচর, স্তাবক সভাসদ্, বিট-বিদূষক মাত্র। চন্দ্রগুপ্ত একদিন আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়াছিল, আমিও লইয়াছি। যার অঙ্কলক্ষ্মীকে কাড়িয়া লইয়াছি, তার সঙ্গে আবার সখ্য কিসের? এখন আমরা দুজনে মিলিয়া তার উচ্ছেদ করিব।"

কিছুক্ষণ নির্বাক্ থাকিয়া সোমদত্তা প্রশ্ন করিল, "কি করিতে চাও?"

"শুন বলিতেছি। প্রভাতে বিবোধবর্মাব মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহা হইতে অনুমান হয় যে, আজ হইতে দশ দিনেব মধ্যে লিচ্ছবিদেশ হইতে পাটলিপুত্রের সাহায্যার্থে সৈন্য আসিবে—পারাবত-মুখে এই সংবাদ আসিয়াছে। চন্দ্রবর্মা যদি পাটলিপুত্র অধিকার করিতে চান, তবে তৎপূর্বেই করিতে হইবে, লিচ্ছবিরা আসিয়া পড়িলে আর তাহা সুসাধ্য হইবে না। তখন নিজের প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িয়া যাইবে। এদিকে নগরের খাদ্যাভাবও ঘুচিয়াছে, সুতরাং বাহুবলে এই দশ দিনের মধ্যে দুর্গ জয় করা অসম্ভব। এরূপ ক্ষেত্রে উপায় কি?"

"কি উপায়?"

"বিশ্বাসঘাতকতা।"

"কে বিশ্বাসঘাতকতা করিবে?"

"আমি করিব। কিন্তু পরিবর্তে চন্দ্রবর্মা আমাকে কি দিবেন?"

"যাহা পাইয়াছ তাহাতে তৃপ্তি নাই?"

"না। কাল বলিয়াছিলাম বটে, রাজ্য—সিংহাসন চাহি না, কিন্তু তাহা ভুল। রাজ্য না পাইলে তোমাকে পাইয়াও আমার অতৃপ্তি থাকিয়া যাইবে। তুমি রাজ-ঐশ্বর্যের স্বাদ পাইয়াছ,—অল্পে কি তোমার মন উঠিবে?"

"তা বটে, অল্পে আমার ক্ষুধা মিটিবে না!...কৃতঘ্নতার মূল্য কি চাও?"

"আমি সব স্থির করিয়াছি। তুমি দীপসংকেতে চন্দ্রবর্মাকে সমস্ত সংবাদ দাও,—জানাও যে বিশ্বাসঘাতকতা ভিন্ন দুর্গ অধিকার হইবে না। তাঁহাকে এ কথাও বল যে, একজন দ্বারপাল সেনানী দুর্গদ্বার খুলিয়া দিতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে মগধের সিংহাসন দিতে হইবে।"

সোমদত্তা প্রস্তরমূর্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিল; তারপর হাসিয়া উঠিল। দীপের কম্পমান আলোকে সে হাসি অদ্ভুত দেখাইল। বলিল, "বেশ বেশ। আমিও তো ইহাই চাহিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম পিতাকে তুষ্ট করিয়া এক জনের জন্য মগধের সিংহাসন ভিক্ষা মাগিয়া লইব, এক স্পর্ধিতা দুর্বিনীতা নারীর দর্পচূর্ণ করিব। কিন্তু এই ভালো। তোমার ও আমার ষড়যন্ত্রে পিতা দুর্গ অধিকার কবিবেন, তারপর তুমি সিংহাসনে বসিবে, আর আমি—আমি তোমার পট্টমহিষী হইব। এই ভালো!"—বলিয়া সোমদত্তা আবার হাসিল।

আমি বলিলাম, "চন্দ্রগুপ্তকে হত্যা করিতে হইবে। তাহাকে বাঁচিতে দিয়া কোন লাভ নাই। পরে গণ্ডগোল বাধিতে পারে। একটা সুবিধা আছে, চন্দ্রগুপ্ত পলাইতে পারিবে না, সে মোহনগৃহের সন্ধান জানে না।"

চন্দ্রগুপ্তের প্রতি সোমদত্তার মনে কোন মমতা আছে কি না, দেখিবার জন্য এই কথা বলিয়াছিলাম। দেখিলাম, তাহার মুখে করুণার ভাব ফুটিয়া উঠিল না, বরঞ্চ মুখ ও অধরোষ্ঠ আরও কঠিনভাব ধারণ করিল। সে স্থির নিষ্করুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মোহনগৃহ কি ?"

মোহনগৃহ কি, বুঝাইয়া দিলে সোমদত্তার মুখে কিছু উৎফুল্লতা দেখা দিল। সে আমার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া বলিল, "প্রিয়তম, চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবী পুত্র লইয়া পলাইবে, এই কথা ভাবিয়া আমার মনে সুখ ছিল না ; এখন নিশ্চিন্ত হইলাম। ভাবিও না, তোমাতে আমাতে নিরাপদে রাজ্যসুখ ভোগ করিব।"

"আর চন্দ্রগুপ্ত ?"

"সে ভার আমার। আমি তার ব্যবস্থা করিব।"

উষার সূচনা করিয়া শীতল বায়ু আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া গেল। পূর্বগগনে কৃষ্ণপক্ষের ক্ষয়প্রাপ্ত শশিকলা রোগপাণ্ডুর মুখ তুলিয়া চাহিল। আমি বলিলাম, "আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, রাত্রি শেষ হইয়া আসিতেছে, এই বেলা সংকেত পাঠাও।"

সোমদত্তা প্রদীপ লইয়া প্রাকারের প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল। প্রসারিত-হস্তে কিছুক্ষণ প্রদীপ ধরিয়া থাকিয়া মুখে নিশাচর পক্ষীর মতো একপ্রকার শব্দ করিল। উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম, পরিখার পরপার হইতে অস্পষ্ট উত্তর আসিল। তখন সোমদত্তা প্রদীপ ধীরে ধীরে সঞ্চালিত করিতে লাগিল। তাপসীর মতো আত্ম-

সমাহিত মুখ, নিশ্চল তন্ময় চক্ষু, সোমদত্তা দীপরশ্মির সাহায্যে সমস্ত সংবাদ বাহিরে প্রেরণ করিল।

সংবাদ শেষ হইলে বাহিরের অন্ধকার হইতে আবার শব্দ আসিল—এবার পাপিয়ার উচ্চতান। শব্দ স্তরে স্তরে উঠিয়া ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলে বিলীন হইয়া গেল।

সোমদত্তা প্রদীপ নামাইয়া বলিল, "কল্য উত্তর পাইবে।"

নিশাবসানে পৌরজন নিদ্রাত্যাগ করিয়া দেখিল, নগরের হট্টে রাশি রাশি খাদ্য স্তূপীকৃত হইয়াছে। ঘৃত, তৈল, শালি-তণ্ডুল, গোধূম, চণক, শাক-সব্জী—কোন বস্তুরই অভাব নাই। কোথা হইতে খাদ্য আসিল, কেহ জানিল না। শুধু দেখা গেল, বুদ্ধ তথাগতেব পাষাণময় বিহারের অভ্যন্তর হইতে এই খাদ্য-স্রোত নিঃসৃত হইতেছে। নাগরিকগণ ঊর্ধ্ব কণ্ঠে সৌগতের জয়ঘোষণা করিতে করিতে হট্টের অভিমুখে ছুটিল।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত তখন মল্লগৃহেব সুচিক্কণ শীতল মণি-কুট্টিমের উপব শয়ান ছিলেন, দুই জন নহাপিত সুগন্ধি তৈল দ্বারা তাঁহার হস্তপদাদি মর্দন করিয়া দিতেছিল। নাগরিকদের এই আনন্দনিনাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল; তিনি মুদিত চক্ষু ঈষন্মাত্র উন্মীলিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বল্লভ, কিসের চিৎকার? চন্দ্রবর্মা কি দুর্গপ্রবেশ করিল?"

সন্নিধাতা বল্লভ সুবর্ণস্থালীর উপর স্ফটিকপাত্রপূর্ণ ফলাম্ররস লইয়া অদূরে দাঁড়াইয়াছিল—মহারাজ স্নানান্তে পান করিয়া শরীর স্নিগ্ধ করিবেন। সে বলিল, "না অজ্জ, বহুদিন পরে পৌরজন খাদ্য পাইয়াছে, তাই মহারাজের জয়-ধ্বনি করিতেছে।"

চন্দ্রগুপ্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "খাদ্য কোথা হইতে আসিল?"

বল্লভ সবিশেষ জানিত না, তথাপি মহারাজের কথার উত্তর দিতে হইবে; বলিল, "বিহারমধ্যে খাদ্য সঞ্চিত ছিল, ভিক্ষুগণ তাহাই বিতরণ করিতেছেন।"

মহারাজ আর প্রশ্ন করিলেন না, পুনশ্চ চক্ষু মুদিত করিয়া কহিলেন, "ভাল, মহাদেবীকে সমাচার দাও। তিনি প্রকৃতি-পুঞ্জের জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিলেন।"

মহারাজের গূঢ় শ্লেষ বল্লভ অনুধাবন করিল না, মহাদেবী বলিতে প্রেয়সী সোমদত্তাকেই বুঝিল। "যথা আজ্ঞা।"—বলিয়া বাহিরে গেল। বাহিরে গিয়া দেখিল, অসংবৃতকুন্তলা এক তরুণী দাসী দ্রুতপদে বহির্মুখে যাইতেছে। বল্লভ ইঙ্গিত করিয়া তাহাকে কাছে ডাকিল, বলিল, "জয়ন্তী, তোমার কেশবেশ যেরূপ বিস্রস্ত, বাহিরে গেলে লোকে নিন্দা করিবে!"

জয়ন্তী মথিত-কজ্জল চক্ষু মার্জনা করিয়া কহিল, "কি প্রয়োজন তাই বল না, রসিকতার সময় নাই। আমি কাজে যাইতেছি।"

বল্লভ বলিল, "কাজ পরে করিও, এখন অন্দরে ফিরিয়া যাও।"—বলিয়া তাহার মুখে সংবাদ পাঠাইয়া দিল।

জয়ন্তী সংবাদ লইতেই আসিতেছিল, ফিরিয়া গিয়া সোমদত্তাকে সকল কথা জানাইল।

সোমদত্তা তখন শীতল হর্ম্যতলে পড়িয়া দুই বাহুর উপর মুখ রাখিয়া চিন্তা করিতেছিল। কি গহন, কি কুটিল তাহার চিন্তা, তাহা কে বলিবে? দাসীর কথা শুনিয়া সে উঠিয়া বসিল। দুই চক্ষু কালিমাবেষ্টিত হইয়া যেন আরও উজ্জ্বল আরও প্রভাময় হইয়াছে, শিশির-কালের প্রস্ফুট হিমচম্পকের ন্যায় কপোল দুইটি পাণ্ডুর। রূপের বুঝি অন্ত নাই! দাসী এই ক্লান্ত-সন্তপ্ত সৌন্দর্যের

সম্মুখ হইতে বোধ করি লজ্জা পাইয়া ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতেছিল ; সোমদত্তা ডাকিল, "জয়ন্তী !"

দাসী ফিরিয়া আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিল, "অজ্জা !"

অধোমুখে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সোমদত্তা বলিল, "তুই একবার বাহিরে যা। বৌদ্ধ-বিহারে গিয়া শ্রমণাচার্য ভিক্ষু অকিঞ্চনকে আমার কাছে ডাকিয়া আন্। বলিবি যে ভিক্ষুণী দীপান্বিতা তাঁহাকে স্মরণ করিয়াছে। আর কঞ্চুকী যদি তাঁর পুরপ্রবেশে বাধা দেয়, এই মুদ্রা দেখাস্।"—বলিয়া আপন কণ্ঠের রত্নহার হইতে সুবর্ণমুদ্রা খুলিয়া দাসীব হস্তে দিল।

জয়ন্তীর মুখ পাংশু হইয়া গেল, সে ভীতকণ্ঠে বলিল, "কিন্তু অজ্জা, কুমারদেবী জানিতে পারিলে—"

সোমদত্তা কহিল, "ত্যক্ত করিস্ না, যা বলিলাম কর্।"

জয়ন্তী প্রস্থান কবিল, মনে মনে বলিতে বলিতে গেল, "তোমার আর কি ! অন্দবে বৌদ্ধ ভিক্ষু ডাকিয়াছি শুনিলে পট্টদেবী আমার মাথাটি খাইবেন।"

ভিক্ষু অকিঞ্চনকে লইয়া যখন জয়ন্তী ফিরিল, তখন সোমদত্তা স্নান করিয়া শুদ্ধশুচি হইয়া বসিয়াছে। ললাটে কুঙ্কুম-তিলক পবিয়াছে, বক্ষে কাঁচুলি বাঁধিয়া উচ্ছল দেহলাবণ্য সংযত করিয়াছে। ভিক্ষু কক্ষে প্রবেশ করিয়া সোমদত্তাকে আশীর্বাদ করিলেন এবং আসন পরিগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসু নেত্রে তাহার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সংঘস্থবিরের বয়স হইয়াছে, মস্তক ও মুখ মুণ্ডিত, পরিধানে পীতবস্ত্র, শান্ত সৌম্য মূর্তি। কৃচ্ছ্রসাধনের ফলে কিছু কৃশ, কিন্তু মুখমণ্ডলে ব্রহ্মচর্যের নির্মল দীপ্তি জাজ্বল্যমান।

সোমদত্তা জয়ন্তীকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। জয়ন্তী প্রস্থান করিলে সে ভিক্ষুকে প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল,

"অর্হৎ, আত্ম-পরিচয় গোপন করিয়া সংঘারামে গিয়াছিলাম—ক্ষমা করুন!"

অকিঞ্চন কহিলেন, "আত্মগোপন করিয়া যে আর্তের সেবা করে, সিদ্ধার্থ তাহাকে অধিক কৃপা করেন।"

সোমদত্তা কহিল, "আজ রাত্রে বোধ হয় সংঘারামে যাইবার অবকাশ হইবে না। তাই অজ্জা কুমারদেবীর বৌদ্ধ-বিদ্বেষ জানিয়াও আপনাকে এখানে আহ্বান করিয়াছি। আমার কিছু জিজ্ঞাস্য আছে।"

অকিঞ্চন কহিলেন, "সময় উপস্থিত হইলে ভগবান শাক্যসিংহ কুমারদেবীকে সুমতি দিবেন।...তোমার জিজ্ঞাস্য কি?"

সোমদত্তা কহিল, "শুনিলাম, নগরে খাদ্য আসিতেছে; এ কথা সত্য?"

"সত্য।"

"কি করিয়া আসিল?"

ভিক্ষু কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিলেন, "তথাগতের কৃপায়।"

সোমদত্তা ঈষৎ অধীর হইয়া বলিল, "তাহা জানি। কিন্তু কোথা হইতে কোন্ পথে আসিল?"

অকিঞ্চন মৃদুহাস্যে বলিলেন, "সংঘের পথে।"

শিরঃসঞ্চালন করিয়া সোমদত্তা কহিল, "তাহাও জানি; খাদ্য সংঘারামে সঞ্চিত ছিল?"

"না।"

"তবে?"

"এ অতি গূঢ় বৃত্তান্ত। দীপান্বিতে, তুমি কৌতূহল প্রকাশ করিও না,—আমি বলিব না।"

"তবে আমিই বলিতেছি। সংঘমধ্যে কোনও সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত

হইয়াছে, সেই পথে দুর্গের বাহির হইতে খাদ্য আসিতেছে—সত্য কি না?”

ইতস্ততঃ করিয়া ভিক্ষু কহিলেন, “সত্য। জান যদি, প্রশ্ন করিতেছ কেন?”

“জানি না, অনুমান করিয়াছি মাত্র। অর্হৎ, কন্যার প্রতি একটি অনুগ্রহ করুন। কি করিয়া কবে এই সুড়ঙ্গ আবিষ্কৃত হইল, আমাকে বলুন।”

কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া সংঘাচার্য বলিলেন, “ভাল, শুন। এই সুড়ঙ্গের সন্ধান একপক্ষ পূর্ব পর্যন্ত আমি অথবা অন্য কেহ জানিত না। আমার পূর্ববর্তী সংঘস্থবিব নির্বাণের পূর্বে মোহপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাই ইহার কথা আমাকে বলিয়া যাইতে পারেন নাই।”

নির্নিমেষ চক্ষুদ্বয় ভিক্ষুর মুখের উপর স্থাপন করিয়া সোমদত্তা শুনিতে লাগিল।

অকিঞ্চন বলিতে লাগিলেন, “সংঘের মধ্যে ভূগর্ভস্থ যে প্রকোষ্ঠে বুদ্ধেব অস্থি রক্ষিত আছে, তাহার উপরে আর একটি কক্ষ আছে, তুমি দেখিয়া থাকিবে। কক্ষটি সচবাচর ব্যবহৃত হয় না, কদাচ আমি মননাদিব জন্য উহা ব্যবহার কবিয়া থাকি। গত পূর্ণিমা-তিথিতে আমি সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, ঘরটি অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়াছে এবং ছাদেব মধ্যস্থলে যে প্রস্তরের ধর্মচক্র ক্ষোদিত আছে, তাহাব উপব মধুমক্ষিকা চক্রনির্মাণ করিয়াছে। ঘরটিকে মল-নির্মুক্ত করিবাব মানসে আমি প্রথমে একটি বংশদণ্ডাগ্রে মশাল যোজিত করিয়া ধূম প্রয়োগ দ্বারা মধুমক্ষিকাগুলিকে বিদূরিত করিলাম; তারপর মধুচক্রটি স্থানচ্যুত কবিবার অভিপ্রায়ে বংশ-দণ্ডদ্বারা উহা তাড়িত করিবামাত্র এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। ধর্মচক্রের মধ্যস্থলে যে ক্ষুদ্র ছিদ্র আছে, তাহার মধ্যে বংশের

অগ্রভাগ প্রবেশ করিবার সঙ্গে সঙ্গে কক্ষপ্রাচীরের এক স্থানে প্রস্তর সরিয়া গিয়া একটা চতুষ্কোণ গহ্বর দেখা দিল। আমি অতিশয় বিস্মিত হইয়া সেই রন্ধ্রটি পরীক্ষা করিলাম, দেখিলাম, অন্ধকার মধ্যে সোপান নামিয়া গিয়াছে।

"পাছে অন্য কেহ আসিয়া পড়ে, এ জন্য তখন আর কিছু করিলাম না—কক্ষের কবাট বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। রাত্রিতে সকলে ঘুমাইলে, প্রদীপ লইয়া কক্ষের ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করিয়া দিয়া সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। প্রস্তর ও ইষ্টকনির্মিত সুড়ঙ্গ, অতিশয় সংকীর্ণ ও অনুচ্চ, মস্তক অবনত করিয়া চলিতে হয়। অর্ধ ক্রোশান্তরে বায়ুপ্রবাহের জন্য কূপ আছে—সেই কূপ সকল লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। আমি এইভাবে বহুদূর পর্যন্ত গমন করিয়াও সুড়ঙ্গের শেষ পাইলাম না। প্রদীপের তৈল নিঃশেষ হইয়া আসিতেছিল, সে রাত্রিতে ভগ্নোদ্যমে ফিরিয়া আসিলাম। তারপর উপর্যুপরি পঞ্চরাত্রি চেষ্টার পর ষষ্ঠরাত্রিতে সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে পৌঁছিলাম। কুক্কুটপাদ বিহারের অঙ্গনে গিয়া সুড়ঙ্গ শেষ হইয়াছে···"

সংহত নিশ্বাসে সোমদত্তা বলিল, "তারপর ?"

নিশ্বাস ফেলিয়া অকিঞ্চন কহিলেন, "কুক্কুটপাদ বিহারের পূর্বশ্রী আর নাই, এখন উহা জনহীন ভগ্নপ্রায়, শ্বাপদের বাসভূমি। কিন্তু গোতমের করুণার উৎস এখনো শতমুখে উৎসারিত হইতেছে। তাই ভগবান পথ দেখাইয়া দিলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া সান্ধিবিগ্রহিককে সংবাদ দিলাম, বলিলাম, সংঘের পথেই বুভুক্ষিতের ক্ষুধা নিবারণ হউক।"

ভিক্ষু নীরব হইলেন। সোমদত্তা নতমুখে চিন্তা করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর ভিক্ষু আসন ত্যাগ করিয়া উঠিবার

উপক্রম করিলেন। তখন সোমদত্তা যুক্তপাণি হইয়া বলিল, "শ্রীমন্, আর একটি প্রশ্ন আছে। এই রাজপুরী যিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন, তিনি কি বৌদ্ধ ছিলেন ?"

অকিঞ্চন কহিলেন, "হাঁ, শুনিয়াছি, অশোক প্রিয়দর্শী এই পুরী নির্মাণ করাইয়াছিলেন, সংঘারামও তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।"

সোমদত্তা প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "ভগবন্, আশীর্বাদ করুন, যেন পূর্ণমনোরথ হইতে পারি।"

হাস্যমুখে অকিঞ্চন কহিলেন, "সুমঙ্গলে, গোতমের ইচ্ছায় তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হইবে—গোতম অন্তর্যামী।"

সংঘস্থবির বিদায় হইলে সোমদত্তা কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে করিতে ভাবিতে লাগিল। দীর্ঘকাল গভীর চিন্তা করিল। ধর্মচক্র! ধর্মচক্র! কিন্তু পুরীমধ্যে কোথাও তো ধর্মচক্র নাই। বুদ্ধের মূর্তি, ধর্মচক্র প্রভৃতি যাহা ছিল, তাহা অপসারিত করিয়া তৎপরিবর্তে দেবমূর্তি স্থাপিত হইয়াছে।

ভাবিতে ভাবিতে অজ্ঞাতসারে তাহার চক্ষু ঊর্ধ্বে নিপতিত হইল। তখন বিস্ফারিত নেত্রে স্তম্ভিত বক্ষে সোমদত্তা দেখিল, উচ্চ ছাদের মধ্যস্থলে রক্তপ্রস্তরে উৎকীর্ণ ধর্মচক্র—এবং তাহার কেন্দ্রমধ্যে ক্ষুদ্র সুগোল একটি ছিদ্র!

বহুক্ষণ তদবস্থ থাকিবার পর সোমদত্তা ছুটিয়া গিয়া জয়ন্তীকে ডাকিল। উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল, "জয়ন্তী, শীঘ্র যা—অস্ত্রাগার হইতে ধনুর্বাণ লইয়া আয়! জিজ্ঞাসা করিলে বলিস্, মহাদেবী সোমদত্তা লক্ষ্যবেধ শিক্ষা করিবেন।"

শব্দতরঙ্গে অন্ধকার পরিপূর্ণ করিয়া বাঁশি বাজিতেছিল। সোমদত্তা প্রদীপের সম্মুখে বসিয়া করতলে চিবুক রাখিয়া এই

দূরাগত বংশীধ্বনি শুনিতেছিল। আমি প্রাকার-কুড্য আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম।

বাঁশি প্রথমে বসন্ত-রাগ ধরিল ; তার পর কিছুক্ষণ গুর্জরী-রাগ লইয়া ক্রীড়া করিয়া আবার বসন্ত-রাগে ফিরিয়া আসিল। শেষে এই দুই রাগ ছাড়িয়া বাঁশি মালকোষ ধরিল। কত নিপুণ সুরের কৌশল, কত মীড়-গমক-ঝংকার, কত তান-লয়ের পরিবর্তন দেখাইল। তার পর সহসা বাঁশি স্তব্ধ হইল।

"বাঁশি কি বলিল ?"

সোমদত্তা যেন তন্দ্রার ঘোর হইতে জাগিয়া উঠিল। অতি দীর্ঘ এক নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল, "তুমি যাহা চাও পাইবে। চন্দ্র-বর্মা তোমাকে মগধের ক্ষত্রপ নিযুক্ত করিবেন। আগামী অমাবস্যার রাত্রিতে দ্বিতীয় প্রহর ঘোষিত হইবার পর আমি এই প্রদীপ দ্বারা রাজপুরীতে অগ্নিসংযোগ করিব। অগ্নি যখন ব্যাপ্ত হইয়া আকাশ লেহন করিবে, সেই সময় তুমি গোতম-দ্বারের অর্গল খুলিয়া দিবে। রাজপ্রাসাদে অগ্নিসংযোগই সংকেত ; এই সংকেত পাইয়া চন্দ্রবর্মার সেনা দুর্গপ্রবেশের জন্য প্রস্তুত থাকিবে, তুমি দ্বার খুলিয়া দিলেই তাহারা প্রবেশ করিবে। পৌরজন রাজপুরী রক্ষার্থ ব্যস্ত থাকিবে, সেই অবসরে চন্দ্রবর্মা বিনা বাধায় পাটলিপুত্র অধিকার করিবেন।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "অমাবস্যার রাত্রি ? তার তো আর বিলম্ব নাই—আগামী পরশ্ব !"

"হাঁ। অধিক বিলম্বে ভয় আছে, লিচ্ছবিগণ আসিয়া পড়িতে পারে।"

ইহার পর সোমদত্তা আবার মৌন অবলম্বন করিল, করলগ্ন-কপোলে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দীপশিখার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল। আমিও সহসা কি কথা বলিব ভাবিয়া পাইলাম না, মানসিক

উত্তেজনা রসনাকে যেন জড় করিয়া দিল। তথাপি চেষ্টা করিয়া কহিলাম, "বাঁশি তো রাগ-রাগিণীর আলাপ করিল, তুমি এত কথা বুঝিলে কি করিয়া?"

সোমদত্তা অন্যমনে কহিল, "ঐ রাগ-রাগিণীতে সংযুক্ত কথাগুলা আমার জানিত। যিনি বাঁশি বাজাইতেছিলেন, তিনি আমার গীতাচার্য ছিলেন।"

অতঃপর আবার দীর্ঘ নীরবতা বিরাজ করিতে লাগিল। কাহারও মুখে কথা নাই। এই সুকঠিন মৌনতা আর সহ্য করিতে না পারিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ভাবিতেছ?"

সোমদত্তা মুখ তুলিয়া বলিল, "ভাবিতেছি, কি অপরিমেয় শক্তি এই ক্ষুদ্র মৃৎপ্রদীপের! এত তুচ্ছ, ভঙ্গুর—মাটিতে পড়িলে ভাঙিয়া শতখণ্ড হইবে; অথচ একটা রাজ্য ধ্বংস করিবার শক্তি ইহার আছে। এমনি কতশত ছার মৃৎপ্রদীপ কেবল রূপশিখার অনলে সংসার ভস্মীভূত করিতেছে!"

আমি তাহার বাক্যের মর্ম বুঝিয়া হস্তধারণ পূর্বক বলিলাম, "মৃৎপ্রদীপ নয়, সোমদত্তা, তুমি রত্নপ্রদীপ! তোমার দীপ্তিতে মগধ আলোকিত হইবে।"

সোমদত্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমি শ্মশানের আলো!··· এখন চলিলাম, সেই অমাবস্যার রাত্রিতে আবার সাক্ষাৎ হইবে। চন্দ্রবর্মাকে সঙ্গে লইয়া প্রাসাদে যাইও, আমি মন্ত্রগৃহে প্রতীক্ষায় থাকিব।"

আমি তাহাকে সাদরে নিকটে টানিয়া লইয়া বলিলাম, "সেই দিন আমাদের মনোরথ পূর্ণ হইবে!"

ঈষৎ হাসিয়া সোমদত্তা বলিল, "হাঁ, সেই দিন আমার মনোরথ পূর্ণ হইবে।"

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত সোমদত্তার কক্ষে রাত্রিকালে নিদ্রা যাইতেছিলেন। অকস্মাৎ তীব্র শ্বাসরোধকর ধূমের গন্ধে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু না খুলিয়াই ডাকিলেন, "সোমদত্তা!" উত্তর পাইলেন না। তখন নিদ্রাকষায়নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, শয্যায় সোমদত্তা নাই। কক্ষের চারিদিকে চাহিলেন, সোমদত্তাকে দেখিতে পাইলেন না।

বাহিরে তখন সমস্ত পুরী জাগিয়া উঠিয়াছে। সদ্যোত্থিতা নারীদের ভীত চিৎকার, গৃহপালিত ময়ূরশারিকা প্রভৃতি পক্ষীদের সচকিত আর্তস্বর এবং সর্বোপরি বিস্তারশীল অগ্নির গর্জন নৈশ বায়ুকে বিলোড়িত করিতেছে। দারুপ্রাসাদে আগুন লাগিলে রক্ষা করিবার কোনও উপায় নাই, পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করাই একমাত্র পথ। পুরীস্থ সকলে মহাকোলাহল করিয়া নিজ নিজ মূল্যবান দ্রব্য যাহা পাইতেছে, লইয়া পলাইতেছে। কে পড়িয়া রহিল, রাজা-রাণী কে মরিল কে বাঁচিল, কাহারও দেখিবার অবসর নাই। নিজের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য সকলেরই উগ্র বাহ্যজ্ঞানশূন্য ত্বরা।

অগ্নি ক্রমশ আরও ব্যাপ্ত হইতে লাগিল; এক প্রাসাদ ছাড়িয়া সংলগ্ন প্রাসাদসকল আক্রমণ করিল। বায়ুর বেগ বাড়িয়া গেল। অমাবস্যা রাত্রির মসীতুল্য অন্ধকার এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে যেন বিদীর্ণ শতখণ্ড হইয়া গেল। বহুদূর পর্যন্ত নগর রক্তাভ আলোকে উদ্ভাসিত হইল।

নাগরিকগণ জাগিয়া উঠিয়া কোলাহল করিতে করিতে রাজপুরীর দিকে ছুটিল। উত্তেজিত বিহ্বল নর-নারী স্খলিতবসনে মুক্ত-কেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্যভাবে জ্বলন্ত রাজপ্রাসাদের চতুর্দিকে সমবেত হইতে লাগিল।

সহসা বহুদূরে সম্মিলিত সহস্রকণ্ঠে মহাজয়ধ্বনি শ্রুত হইল। রাজপুরীর চারিপাশে সমবেত নাগরিকগণ ঊর্ধ্বমুখে অনলোল্লাস দেখিতেছিল, তাহার মধ্য হইতে কে একজন চিৎকার করিয়া বলিল, "পালাও! পালাও! নগরে শত্রু প্রবেশ করিয়াছে!"— অমনই বিক্ষুব্ধ জনতা উন্মত্তের ন্যায় চারিদিকে দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কেহ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে পড়িয়া গিয়া জানু ভাঙিল, কেহ জনমর্দের চরণতলে পড়িয়া পিষ্ট হইয়া গেল। ক্রন্দন, হাহাকার এতক্ষণ রাজপুরীর মধ্যে নিবদ্ধ ছিল, এবার নগরময় ছড়াইয়া পড়িল।

সোমদত্তা তখন কোথায়?

সোমদত্তা তখন আলুলায়িত কুন্তলে, লুণ্ঠিত বসনে পট্ট-মহাদেবীর প্রাসাদে প্রবেশ কবিতেছে। কুমাবদেবীর ভবনে তখনও ভালো করিয়া আগুন লাগে নাই; কিন্তু দাসী, কিঙ্করী, প্রহরিণী— যে যেখানে ছিল, সকলে পলাইয়াছে। কুমারদেবীর অরক্ষিত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া সোমদত্তা দেখিল, বিস্তৃত শয্যার উপর পুত্রকে বুকের কাছে লইয়া তিনি তখনও নিদ্রিতা।

সোমদত্তা সবলে তাঁহার অঙ্গে নাড়া দিয়া বলিল, "দেবী, উঠুন, উঠুন—প্রাসাদে আগুন লাগিয়াছে!"

কুমারদেবী চক্ষু মুছিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "কে?"

"আমি, সোমদত্তা। আব বিলম্ব কবিবেন না, শীঘ্র শয্যাত্যাগ করুন"—বলিয়া ঘুমন্ত সমুদ্রগুপ্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইতে গেল।

কুমারদেবীর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ও কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমার পুত্রকে স্পর্শ করিও না। দাসীরা কোথায়?"

"কেহ নাই, সকলে প্রাণভয়ে পলাইয়াছে।"

"মহলে কি করিয়া আগুন লাগিল?"

আর গোপন করিবার প্রয়োজন ছিল না। সোমদত্তা স্থির-দৃষ্টিতে কুমারদেবীর মুখের পানে চাহিয়া বলিল, "আমি মহলে আগুন দিয়াছি।"

কুমারদেবী চিৎকার করিয়া কহিলেন, "স্বৈরিণী! তাহা জানি। যখন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে ঘরে আনিয়াছিস্ তখনি তোর অভিসন্ধি বুঝিয়াছি।"

সোমদত্তা কহিল, "অজ্জা, ক্রোধে অন্ধ হইয়া নির্দোষের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। সেই বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রসাদেই আজ আপনাদের প্রাণরক্ষা করিতে পারিব। এখন আসুন, পুরী এতক্ষণ ভস্মসাৎ হইল। আর বিলম্ব করিলে বুঝি আপনাদের বাঁচাইতে পারিব না।"

"তুই বাঁচাইবি? কেন, আমি কি আত্মরক্ষা করিতে জানি না?"

"না অজ্জা, আজ আমি ভিন্ন আর কেহ আপনাদেব বাঁচাইতে পারিবে না।"

"তার অর্থ?"

"তার অর্থ চন্দ্রবর্মার সেনা দুর্গে প্রবেশ করিয়াছে, এতক্ষণে বোধ করি রাজপুরী ঘিরিল।"

কুমারদেবীব চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহিব হইতে লাগিল, "ডাকিনী! এ তোর কার্য; তুই মগধরাজ্য ছারখারে দিলি!"

সোমদত্তা স্থিরভাবে বলিল, "স্বীকার করিলাম। কিন্তু আর বিলম্ব করিলে কুমারকে বাঁচাইতে পারিব না। ঐ দেখুন, অগ্নি প্রাসাদ বেষ্টন করিয়াছে।"

এই সময় অর্ধচন্দ্রাকৃতি বাতায়নপথে অগ্নির আরক্ত লোলরসনা ও কুণ্ডলিত ধূমোদগার কক্ষে প্রবেশ করিল।

সোমদত্তা সমুদ্রগুপ্তকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া বলিল, "আজ আমার স্বামীর বংশধরকে বাঁচাইব বলিয়া আসিয়াছি, নহিলে আসিতাম না। আপনি থাকিতে হয় থাকুন, আমি চলিলাম।"—বলিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল।

কুমারদেবী ছুটিয়া আসিয়া তাহার বাহু ধরিলেন, বলিলেন, "রাক্ষসী, ছাড়িয়া দে, আমার পুত্রকে ছাড়িয়া দে!"

সোমদত্তা প্রজ্বলিত নয়নে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "দুর্ভাগিনী, নিজেব ইষ্ট বুঝিতে পার না? আমার স্বামীর পুত্র কি আমার পুত্র নয়? এ রাজ্যে আগুন আমি জ্বালি নাই, জ্বালিয়াছে তোমার দুরন্ত অন্ধ অভিমান। সেই আগুনে তুমি পুড়িয়া মর!"

কুমারদেবীর হাত ছাড়াইয়া পুত্র বুকে লইয়া সোমদত্তা ধূমান্ধকাব অলিন্দের ভিতর দিয়া ছুটিয়া চলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে উন্মাদিনীব ন্যায় কুমারদেবী তাহার পশ্চাতে চলিলেন।

নিজ শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সোমদত্তা দেখিল, রাজা অভিভূতেব ন্যায় শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন—চতুর্দিকে কি ঘটিতেছে, তাঁহাব যেন কোনও ধাবণা নাই। ঘর ধূমাচ্ছন্ন—ঘরের চারিকোণে চাবিটি স্বর্ণ-প্রদীপ তখনও ক্ষীণ আলোক বিস্তার করিয়া জ্বলিতেছে।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে পুত্রকে স্বামীব ক্রোড়ে ফেলিয়া দিয়া সোমদত্তা ছুটিয়া গিয়া ধনুর্বাণ লইয়া আসিল। ভালো দেখা যায় না, দুই চক্ষু বহিয়া অশ্রুধারা ঝরিতেছে, সোমদত্তা ধর্মচক্রের মধ্যস্থল লক্ষ্য কবিয়া শবসন্ধান করিল। লক্ষ্যভ্রষ্ট শব পাথরে লাগিয়া ফিরিয়া আসিল। আবাব শরনিক্ষেপ করিল, ব্যর্থ শর আবাব প্রতিহত হইয়া ভূমিতে পড়িল। অদম্য ক্রন্দনের আবেগে সোমদত্তার বক্ষ ফাটিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তবে কি গুপ্তদ্বার খুলিবে না?

এদিকে ঘরের মধ্যে অগ্নির অসহ্য উত্তাপ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। রাজা এবং কুমারদেবী নির্বাক্ নিষ্পলক হইয়া সোমদত্তার এই উন্মত্তবৎ কার্য দেখিতে লাগিলেন। সোমদত্তা অসীম বলে আপনাকে সংযত করিয়া পুনশ্চ ধনুর্বাণ তুলিয়া লইল। লক্ষ্যবস্তু নিকটেই, কিন্তু ভালো করিয়া দেখা যায় না, হাত কাঁপে, চক্ষু কূলে কূলে ভরিয়া উঠে। বহুক্ষণ ধরিয়া, অনেকবার চক্ষু মুছিয়া, অতি সাবধানে লক্ষ্য স্থির করিয়া সোমদত্তা তীর ছুঁড়িল। এবার আর তীর ফিরিয়া আসিল না—ধর্মচক্রের মধ্যস্থলে বিঁধিয়া রহিল। সোমদত্তা ধনু ফেলিয়া দিয়া একবার ক্ষণকালের জন্য মাটিতে লুটাইয়া পড়িল।

কিন্তু পরক্ষণেই চক্ষু মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কুমারদেবীর নিকট গিয়া বলিল, "অজ্জা, এইবার স্বামিপুত্র লইয়া এই সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করুন। সুড়ঙ্গ নগর-বাহিরে কুক্কুটপাদ বিহারে গিয়া শেষ হইয়াছে। সেখানে শত্রু নাই, সেখান হইতে সহজেই নিবাপদ স্থানে যাইতে পারিবেন।"

চন্দ্রগুপ্ত সুড়ঙ্গমুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন, এতক্ষণে প্রথম কথা কহিলেন, "নগরেব বাহিরে যাইবার প্রয়োজন কি ?"

সোমদত্তা কহিল, "প্রয়োজন আছে। শত্রু নগর অধিকার করিয়াছে।"

তখন পুত্র লইয়া দুইজনে সুড়ঙ্গে প্রবেশ করিলেন। সোমদত্তা চন্দ্রগুপ্তের চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "প্রিয়তম! এইবার বিদায় দাও।"

সহসা চন্দ্রগুপ্ত যেন তাঁহার সমস্ত চেতনা ফিরিয়া পাইলেন ; ভীষণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সোমদত্তা, তুমি আসিবে না ?"

সোমদত্তা দুই হাতে মুখ ঢাকিল ; বলিল, "না প্রিয়তম, আমি

আর তোমার সঙ্গে যাইবার যোগ্য নহি। কেন নহি, তাহা দেবীর মুখে শুনিও। চন্দ্রবর্মা আমার পিতা—এই কথা মনে করিয়া যদি পারো, আমাকে ক্ষমা করিও। তোমরা যাও—আমি ভিন্ন পথে যাইব।"

হৃদয়-বিদারক স্বরে চন্দ্রগুপ্ত ডাকিলেন, "সোমদত্তা!" দুই হস্তে কর্ণ আবরণ করিয়া সোমদত্তা কাঁদিয়া উঠিল, "না না, ডাকিও না—আমি যাইতে পারিব না। আমায় মরিতে হইবে। প্রাণাধিক, আবার জন্মান্তরে দেখা হইবে, তখন তোমার সোমদত্তাকে সঙ্গে লইও।"

এই বলিয়া সবলে টানিয়া সুড়ঙ্গের পাষাণ-দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। চন্দ্রগুপ্তের মুখনিঃসৃত অর্ধোচ্চারিত বাণী পাষাণ প্রাচীরে লাগিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল।

তখন সেই উত্তপ্ত হর্ম্যতলে পড়িয়া, বসুধা আলিঙ্গন করিয়া, কেশ বিকীর্ণ করিয়া, ভূতলে ললাট প্রহত করিয়া সোমদত্তা কাঁদিল।

কিন্তু তবু অগ্নি নিবিল না।

এক হস্তে মুক্ত তরবারি, অন্য হস্তে প্রজ্বলিত উল্কা লইয়া দুর্গাবরোধকারী সেনা গোতম-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিল। তাহাদের পুরোভাগে লৌহবর্মাবৃত ধাতুনির্মিত শিরস্ত্রাণধারী ভীষণাকৃতি স্বয়ং চন্দ্রবর্মা। দ্বারের প্রহরীদিগকে পূর্বেই সরাইয়া দিয়াছিলাম, সুতরাং একবিন্দুও রক্তপাত হইল না।

চন্দ্রবর্মা আমাকে দেখিয়া পরুষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিই বিশ্বাসঘাতক দ্বারপাল?"

কথার ভাবটা ভালো লাগিল না। যাহার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা

করিলাম, সে-ই বিশ্বাসঘাতক বলে! যাহা হউক, বিনীত কণ্ঠে বলিলাম, "হাঁ আমিই। সম্রাটের জয় হউক।"

চন্দ্রবর্মা নিষ্করুণ আরক্ত দুই চক্ষু আমার মুখের উপর স্থাপন করিয়া মনে মনে কি যেন গবেষণা করিল, তার পর বলিল, "ভালো, সর্বাগ্রে পথ দেখাইয়া রাজপ্রাসাদে লইয়া চল।"

পথ দেখাইয়া লইয়া যাইবার কোনও প্রয়োজন ছিল না। বিরাট অনলস্তম্ভের মতো প্রাসাদ তখন জ্বলিতেছে—সমস্ত নগর আলোকিত করিয়াছে। আপনার প্রভায় রাজপুরী স্বয়ংপ্রকাশ।

সেনাদলের অগ্রে অগ্রে আমি চলিলাম। পথে কেহ গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিল না, যে সম্মুখে পড়িল চৈত্রের বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্রের মতো নিমেষমধ্যে বিপরীত মুখে অন্তর্হিত হইল।

প্রাসাদের শূন্য তোরণ পার হইয়া সদলবলে সম্মুখস্থ মন্ত্রগৃহে প্রবেশ করিলাম। অগ্নি তখনও মন্ত্রগৃহ পর্যন্ত সংক্রামিত হয় নাই, তবে দীর্ঘ জিহ্বা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতেছে—অচিরাৎ গ্রাস করিবে।

বিশাল বহুস্তম্ভযুক্ত মন্ত্রগৃহ প্রায়ান্ধকার, জনশূন্য। কেবল তাহার মধ্যস্থলে সিংহাসনের বেদীর সম্মুখে সোমদত্তা দাঁড়াইয়া আছে। অশনিপূর্ণ বৈশাখী মেঘের ন্যায় তাহার মূর্তি; বক্ষে পৃষ্ঠে মুক্ত কৃষ্ণ কেশজাল, ললাটে রক্তরেখা, নয়নের কৃষ্ণতারকায় জ্বালাময় বিদ্যুৎ।

বহু মশালের দীপ্তিতে মন্ত্রগৃহ আলোকিত হইল। তখন সোমদত্তা চন্দ্রবর্মাকে দেখিতে পাইয়া দ্রুতপদে আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল।

"বৎসে! কল্যাণী!"—বলিয়া চন্দ্রবর্মা সোমদত্তাকে পদপ্রান্ত হইতে তুলিলেন। ক্ষণকালের জন্য এই ভীষণ দুর্ধর্ষ যোদ্ধার কণ্ঠস্বর যেন প্রসাদগুণ প্রাপ্ত হইল।

সোমদত্তা অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "পিতা, আমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে।"

চন্দ্রবর্মা বলিলেন, "পুত্রী, সে তোমারই জন্য! তোমার যোগ্য পুরস্কার আমি সযত্নে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছি। এখন এই রত্নহার গ্রহণ কর।"—বলিয়া নিজ বক্ষ হইতে অমূল্য রশ্মিকলাপ মণিহার খুলিয়া সোমদত্তার হস্তে দিলেন।

সোমদত্তা হার দুই হস্তে ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিল; বলিল, "আর আমার পুরস্কারে প্রয়োজন নাই। আমাব জীবনেব সমস্ত প্রয়োজন শেষ হইয়াছে।"

চন্দ্রবর্মা বলিলেন, "সে কি! চন্দ্রগুপ্ত কোথায়?"

সোমদত্তা কহিল, "তা নয়, আমি বিধবা হই নাই। কিন্তু আমার স্বামীকে আর আপনি খুঁজিয়া পাইবেন না। তিনি পুরী ত্যাগ করিয়াছেন।"

"পুবী ত্যাগ করিয়াছে! কোথায় গেল?"

"তাঁহাকে গুপ্তপথে দুর্গের বাহিরে পাঠাইয়াছি।"

"কন্যা, এ কার্য কেন কবিলে?"

"দেব, এ ভিন্ন আমার আর অন্য পথ ছিল না। তিনি থাকিলে সকল কথা জানিতে পাবিতেন, তাহা হইলে মরিয়াও আমার এ নবক-যন্ত্রণা শেষ হইত না। পিতা, আমাব কিছুই নাই—সব গিয়াছে। নাবীব যাহা কিছু মূল্যবান, যাহা কিছু প্রেয়, এক নবকেব পশু তাহা হবণ করিয়াছে।"

অঙ্গারেব মতো দুই চক্ষু সোমদত্তা আমার দিকে ফিরাইল। তর্জনী প্রসারিত করিয়া বিকৃতমুখে চিৎকার করিয়া কহিল, "এই নরকেব পশু আমার সর্বস্ব হরণ করিয়াছে!"

অল্পকালের জন্য সমস্ত পৃথিবী যেন নীরব হইয়া গেল। আমি

আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে রক্তপ্রবাহের শব্দ শুনিতে পাইলাম। তার পর ব্যাঘ্রের মতো গর্জন করিয়া চন্দ্রবর্মা আসিয়া আমার কেশমুষ্টি ধারণ করিল। অন্য হস্তের অঙ্গুলিগুলা আমার চক্ষু উৎপাটিত করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিল, ক্রূর হাসি হাসিয়া সোমদত্তা কহিল,—“পিতা, ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, আমি পুরস্কার লইব। এই পিশাচকে এখনি মারিবেন না, ইহাকে তিলে তিলে দগ্ধ করিয়া মারিবেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া বিষকণ্টকপূর্ণ অন্ধকূপে যেন এই নরাধম পচিয়া পচিয়া মরে, গলিত ক্রিমিপূর্ণ শূকরমাংস ভিন্ন যেন অন্য খাদ্য না পায়; মরিবার পূর্বে যেন ইহার প্রত্যেক অঙ্গ গলিয়া খসিয়া পড়ে! আমার আত্মা পরলোক হইতে দেখিয়া সুখী হইবে।”

চন্দ্রবর্মা আমার কেশ ছাড়িয়া দিয়া বলিল, “তাহাই করিব!··· ইহাকে বাঁধিয়া রাখ।”

দশ জন মিলিয়া আমাকে বাঁধিয়া মাটিতে ফেলিল। তখন সোমদত্তা আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। আমার প্রতি অগ্নিপূর্ণ দুই চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া থাকিয়া সে আমার মুখে একবার পদাঘাত করিল। তারপর চন্দ্রবর্মার নিকট ফিবিয়া গিয়া স্থিব শান্ত স্বরে কহিল, “পিতা, এইবাব পিতার কার্য করুন।”

চন্দ্রবর্মার বজ্রের মতো কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল, “কি কার্য, বৎসে?”

সোমদত্তা বলিল, “এ দেহ আপনিই দিয়াছিলেন, আপনিই ইহার নাশ করুন।”

পাষাণ-স্তম্ভেব মতো চন্দ্রবর্মা নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সোমদত্তা পুনরায় কহিল, “আমার মন নিষ্কলুষ, এই দূষিত দেহ হইতে তাহাকে মুক্ত করিয়া পিতার কর্তব্য করুন।”

বহুক্ষণ পরে অস্ফুট কণ্ঠে চন্দ্রবর্মা বলিলেন, "সেই ভালো, সেই ভালো।"

সোমদত্তা তখন দুই হস্তে বক্ষের কঞ্চুলী ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পিতার সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিল।

চন্দ্রবর্মা দক্ষিণহস্তে সুতীক্ষ্ণ ভল্ল তুলিয়া লইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া কর্কশভয়ানক কণ্ঠে কহিলেন, "সকলে শুন, আমার কন্যার দেহ অশুচি হইয়াছিল, আমি তাহা ধ্বংস করিলাম।"—বলিয়া দুই পদ পিছু হটিয়া গিয়া ভল্ল ঊর্ধ্বে তুলিলেন। সোমদত্তা উন্মুক্ত বক্ষে নির্ভীক নিষ্পলক দৃষ্টিতে পিতার মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল।

আমি সভয়ে চক্ষু মুদিলাম।

পুনরায় যখন চক্ষু উন্মীলিত করিলাম, তখন দেখিলাম, রক্ত-চন্দন-চর্চিত শৈবালবেষ্টিত শ্বেত কমলিনীর মতো সোমদত্তার বিগত-প্রাণ দেহ মাটিতে পড়িয়া আছে।

চক্রায়ুধ ঈশানবর্মা নামক জনৈক নাগরিকের ঘৃণিত জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছি। দিগ্বিজয়ী চন্দ্রবর্মা পাটলিপুত্রের প্রাসাদভূমির এক প্রান্তে এক অর্ধশুষ্ক কূপমধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। কূপের মুখ ঘনসন্নিবিষ্ট লৌহজাল দ্বারা আঁটিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই কূপের দুর্গন্ধ পঙ্কে আ-কটি নিমজ্জিত হইয়া, ভেক-সরীসৃপ-পরিবৃত হইয়া আমার অন্তিম তিন মাস কাটিয়াছিল।

জয়ন্তী নাম্নী পুরীর এক দাসী চণ্ডালহস্তে শূকর মাংস আনিয়া প্রত্যহ সন্ধ্যায় আমার জন্য কূপে ফেলিয়া দিয়া যাইত। এই জয়ন্তীর নিকট আমি রাজ-অবরোধের অনেক কথা শুনিতে পাইতাম। জয়ন্তী সোমদত্তার সহচরী কিঙ্করী ছিল; সে সোমদত্তার মনের অনেক কথা জানিত, অনেক কথা অনুমান করিয়াছিল। সে কূপমুখে বসিয়া সোমদত্তার কাহিনী বলিত, আমি নিম্নে অন্ধকারে কীটদংশনবিক্ষত অর্ধগলিত দেহে দাঁড়াইয়া উৎকর্ণ হইয়া তাহা শুনিতাম।

একদিন জয়ন্তীকে বলিয়াছিলাম, "জয়ন্তী, আমাকে উদ্ধার করিবে? আমার বহু গুপ্তধন মাটিতে প্রোথিত আছে, যদি মুক্তি পাই, তোমাকে দশ হাজার স্বর্ণদীনার দিব। তোমাকে আর চেটীবৃত্তি করিতে হইবে না।"

ভীতা জয়ন্তী আমাকে গালি দিয়া পলায়ন করিয়াছিল, আর আসে নাই। অনন্তর চণ্ডাল একাকী আসিয়া মাংস দিয়া যাইত।

আমি একাকী এই জীবন্ত নরকে বসিয়া থাকিতাম আর ভাবিতাম। কি ভাবিতাম, তাহা বলিবার এ স্থান নহে। তবে সোমদত্তা আমার চিন্তার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া থাকিত। ভাবিতাম, সোমদত্তার মনে যদি ইহাই ছিল, তবে সে আমার নিকট আত্মসমর্পণ করিল কেন? যদি চন্দ্রগুপ্তকে এত ভালোবাসিত, তবে বিশ্বাসঘাতিনী না হইয়া আত্মঘাতিনী হইল না কেন? রমণীর হৃদয়ের রহস্য কে বলিবে? তখন এ প্রশ্নের কোনও উত্তর পাই নাই।

কিন্তু আজ বহু জীবনের পরপারে বসিয়া মনে হয়, যেন সোমদত্তার চরিত্র কিছু কিছু বুঝিয়াছি। সোমদত্তা গুপ্তচররূপে রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া ক্রমে চন্দ্রগুপ্তকে সমস্ত মনপ্রাণ ঢালিয়া ভালোবাসিয়াছিল। কুমারদেবী চন্দ্রগুপ্তকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন, ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। তাই সে সংকল্প করিয়াছিল, চন্দ্রবর্মাকে দুর্গ অধিকারের সাহায্য করিয়া পরে স্বামীর জন্য পাটলিপুত্র-রাজ্য ভিক্ষা মাগিয়া লইবে; কুমারদেবীর প্রভাব অস্তমিত হইবে, চন্দ্রগুপ্ত সত্যই রাজা হইবেন এবং সেই সঙ্গে সোমদত্তাও স্বামিসোহাগিনী হইয়া পট্টমহিষীর আসন গ্রহণ করিবে।

আমার দুরন্ত লালসা যখন তাহার গোপন সংকল্পের উপর খড়্গের মতো পড়িয়া উহা খণ্ডবিখণ্ড করিয়া দিল, তখন তাহার মনের কি অবস্থা হইল সহজেই অনুমেয়। নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিণী হীন গুপ্তচর বলিয়া কোন্ রমণী ধরা পড়িতে চাহে? সোমদত্তা দেখিল, ধরা পড়িলে স্বামীর অতুল ভালোবাসা সে হারাইবে; সে যে চন্দ্রগুপ্তকেই রাজ্য ফিরিয়া দিবার মানসে চক্রান্ত করিয়াছে, এ কথা চন্দ্রগুপ্ত বুঝিবে না, নীচ বিশ্বাসঘাতিনী বলিয়া

ঘৃণাভরে তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। এদিকে চক্রায়ুধের হস্তেও নিস্তার নাই, ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, ধর্মনাশ নিশ্চিত। এরূপ অবস্থায় অসহায়া জালবদ্ধা কুরঙ্গিণী কি করিবে?

অপরিমেয় ভালোবাসার যূপে সোমদত্তা সতীধর্ম বিসর্জন দিল। ভাবিল, আমার তো চরম সর্বনাশ হইয়াছে, কিন্তু এই মর্মভেদী লজ্জার কাহিনী স্বামীকে জানিতে দিব না। এখন আমার যাহা হয় হউক, তারপর যে আমার জীবন ধ্বংস করিয়াছে, তাহাকে যমালয়ে পাঠাইয়া নিজেও নরকে যাইব। কিন্তু স্বামীকে কিছু জানিতে দিব না।

ইহাই সোমদত্তার আত্মবিসর্জনের অন্তরতম ইতিহাস।

কিন্তু আর না, সোমদত্তার কথা এইখানেই শেষ করিব। এই নারীর কথা স্মরণে ষোল শত বৎসর পরে আজও আমার মন মাতাল হইয়া উঠে। জানি, সোমদত্তার মতো নারীকে বিধাতা আমার জন্য সৃষ্টি করেন নাই—সে দেবভোগ্যা। জন্মজন্মান্তরের ইতিহাস খুঁজিয়া এমন একটিও নারী দেখিতে পাই না, যাহার সহিত সোমদত্তার তুলনা করিব। আর কখনও এমন দেখিব কি না জানি না।

আমি বিশ্বাস করি, জন্মান্তরের পরিচিত লোকের সহিত ইহজন্মে সাক্ষাৎ হয়। সোমদত্তার সহিত যদি আবার আমার সাক্ষাৎ হয়, জানি, তাহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিব। নূতন দেহের ছদ্মবেশ তাহাকে আমার চক্ষু হইতে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে না।

কিন্তু সে-ও কি আমাকে চিনিতে পারিবে? তাহার ললাটে কি স্মৃতির ভ্রূকুটি দেখা দিবে? অধরে সেই অন্তিমকালের অপরিসীম ঘৃণা স্ফুরিত হইয়া উঠিবে? জানি না। জানি না।

পূর্বে বলিয়াছি যে, আমি বিশ্বাস করি, জন্মান্তরের পরিচিত লোকের সঙ্গে ইহজন্মে সাক্ষাৎ হয়। আপনি তাহার মুখের পানে অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকেন, চিনি-চিনি করিয়াও চিনিতে পারেন না। মনে করেন, পূর্বে কোথাও দেখিয়া থাকিবেন। এই পূর্বে যে কোথায় এবং কত দিন আগে, আপনি তাহা জানেন না; আমি জানি। ভগবান আমাকে এই অদ্ভুত শক্তি দিয়াছেন। তাহাকে দেখিবামাত্র আমার মনের অন্ধকার চিত্রশালায় চিত্রের ছায়াবাজি আরম্ভ হইয়া যায়। যে কাহিনীর কোনও সাক্ষী নাই, সেই কাহিনীর পুনরভিনয় চলিতে থাকে। আমি তখন আর এই ক্ষুদ্র আমি থাকি না, মহাকালের অনিরুদ্ধ স্রোতঃপথে চিরন্তন যাত্রীর মতো ভাসিয়া চলি। সে যাত্রা কবে আরম্ভ হইয়াছিল জানি না, কত দিন ধরিয়া চলিবে তাহাও ভবিষ্যের কুজ্ঝটিকায় প্রচ্ছন্ন। তবে ইহা জানি যে, এই যাত্রা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন অব্যাহত। মাঝে মাঝে মহাকালের নৃত্যের ছন্দে যতি পড়িয়াছে মাত্র—সমাপ্তির 'সম' কখনও পড়িবে কি না এবং পড়িলেও কবে পড়িবে, তাহা বোধ করি বিধাতারও অজ্ঞেয়।

মহেঞ্জোদাড়োর নগর ও মিশরের পিরামিড যখন মানুষের কল্পনায় আসে নাই, তখনও আমি জীবিত ছিলাম। এই আধুনিক সভ্যতা কয় দিনের? মানুষ লোহা ব্যবহার করিতে শিখিল কবে? কে শিখাইল? প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পরশুমুণ্ড পরীক্ষা করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজিতেছেন, কিন্তু উত্তর পাইতেছেন না। আমি বলিতে পারি, কবে লোহার অস্ত্র ভারতে প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু সন-তারিখ দিয়া বলিতে পারিব না। সন-তারিখ তখনও তৈয়ার হয় নাই। তখন আমরা কাঁচা মাংস খাইতাম।

চারিদিকে পাহাড়ের গণ্ডি দিয়া ঘেরা একটি দেশ, মাঝখানে গোলাকৃতি সুবৃহৎ উপত্যকা। 'যজ্ঞিবাড়ি'তে কাঠের পরাতের উপর ময়দা স্তূপীকৃত করিয়া ঘি ঢালিবার সময় তাহার মাঝখানে যেমন নামাল করিয়া দেয়, আমাদের পর্বতবলয়িত উপত্যকাটি ছিল তাহারই একটি সুবিরাট সংস্করণ। আবার বিধাতা মাঝে মাঝে আকাশ হইতে প্রচুর ঘৃতও ঢালিয়া দিতেন; তখন ঘোলাটে রাঙা জলে উপত্যকা কানায় কানায় ভরিয়া উঠিত। পাহাড়ের অঙ্গ বহিয়া শত নির্ঝরিণী সগর্জনে নামিয়া আসিয়া সেই হ্রদ পুষ্ট করিত। আবার বর্ষাপগমে জল শুকাইত, কতক গিরিরন্ধ্র পথে বাহির হইয়া যাইত; তখন অগভীর জলের কিনারায় একপ্রকার দীর্ঘ ঘাস জন্মিত। ঘাসের শীর্ষে ছোট ছোট দানা ফলিয়া ক্রমে সুবর্ণবর্ণ ধারণ করিত। এই গুচ্ছ গুচ্ছ দানা কতক ঝরিয়া জলে পড়িত, কতক উত্তর হইতে ঝাঁকে ঝাঁকে হংস আসিয়া খাইত। সে সময় জলের উপরিভাগ অসংখ্য পক্ষীতে শ্বেতবর্ণ ধারণ করিত এবং তাহাদের কলধ্বনিতে দিবারাত্রি সমভাবে নিনাদিত হইতে থাকিত। শীতের সময় উচ্চ পাহাড়গুলার শিখরে শিখরে তূলার মতো তুষারপাত হইত। আমরা তখন মৃগ, বানর, ভল্লুকের চর্ম গাত্রাবরণরূপে পরিধান করিতাম। গিরিকন্দরে তুষার-শীতল বাতাস প্রবেশ করিয়া অস্থি পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিত। পাহাড়ে শুষ্ক তরুর ঘর্ষণে অগ্নি জ্বলিতে দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু অগ্নি তৈয়ার করিতে তখনও শিখি নাই। অগ্নিকে বড় ভয় করিতাম।

আমাদের এই উপত্যকা কোথায়, ভারতের পূর্বে কি পশ্চিমে, উত্তরে কি দক্ষিণে, তাহা আমার ধারণা নাই। ভারতবর্ষের সীমানার মধ্যে কি না, তাহাও বলিতে পারি না। উপত্যকার কিনারায় পাহাড়ের গুহাগুলির মধ্যে আমরা একটা জাতি বাস

করিতাম ; পর্বতচক্রের বাহিরে কখনও যাই নাই, সেখানে কি আছে তাহাও জানিতাম না। আমাদের জগৎ এই গিরিচক্রের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল। পাহাড়ে বানর, ভল্লুক, ছাগ, মৃগ প্রভৃতি নানাবিধ পশু বাস করিত, আমরা তাহাই মারিয়া খাইতাম ; ময়ূরজাতীয় একপ্রকার পক্ষী পাওয়া যাইত, তাহার মাংস অতি কোমল ও সুস্বাদু ছিল। তাহার পুচ্ছ দিয়া আমাদের নারীরা শিরোভূষণ করিত। গাছের ফলমূলও কিছু কিছু পাইতাম, কিন্তু তাহা যৎসামান্য ; পশুমাংসই ছিল আমাদের প্রধান আহার্য।

চেহারাও আহারের অনুরূপ ছিল। মাথায় ও মুখে বড় বড় জটাকৃতি চুল, রোমশ কপিশ-বর্ণ দেহ, বাহু জানু পর্যন্ত লম্বিত। দেহ নিতান্ত খর্ব না হইলেও প্রস্থের দিকেই তাহার প্রসার বেশী। এরূপ আকৃতির মানুষ আজকালও মাঝে মাঝে দু'একটা চোখে পড়ে, কিন্তু জামা কাপড়ের আড়ালে স্বরূপ সহসা ধরা পড়ে না। তখন আমাদের জামা-কাপড়ের বালাই ছিল না, প্রসাধনের প্রধান উপকরণ ছিল পশুচর্ম। তাহাও গ্রীষ্মকালে বর্জন করিতাম, সামান্য একটু কটিবাস থাকিত।

আমাদের নারীরা ছিল আমাদের যোগ্য সহচরী—তাম্রবর্ণা, কৃশাঙ্গী, ক্ষীণকটি, কঠিনস্তনী। নখ ও দন্তের সাহায্যে তাহারা অন্য পুরুষের নিকট হইতে আত্মরক্ষা করিত। স্তন্যপায়ী শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া অন্যহস্তে প্রস্তরফলকাগ্র বর্শা পঞ্চাশহস্ত দূরস্থ মৃগের প্রতি নিক্ষেপ করিতে পারিত। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে ইহারা যখন গুহাদ্বারে বসিয়া পক্ব লোহিত ফলের কর্ণাভরণ দুলাইয়া মৃদুগুঞ্জনে গান করিত, তখন তাহাদের তীব্রোজ্জ্বল কালো চোখে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিত। আমরা প্রস্তরপিণ্ডের অন্তরালে

লুকাইয়া নিস্পন্দবক্ষে শুনিতাম—বুকের মধ্যে নামহীন আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত।

এই সব নারীর জন্য আমরা যুদ্ধ করিতাম, হিংস্র শ্বাপদের মতো পরস্পর লড়িতাম। ইহারা দূরে দাঁড়াইয়া দেখিত। যুদ্ধের অবসানে বিজয়ী আসিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাইত। আমাদের জাতির মধ্যে নারীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল···

কিন্তু গোড়া হইতে আরম্ভ করাই ভালো। কি করিয়া এই অর্ধপশু জীবনের স্মৃতি জাগরূক হইল, পূর্বে তাহাই বলিব।

পূজার ছুটিতে হিমাচল অঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। রেলের চাকরিতে আর কোনও সুখ না থাক, ঐটুকু আছে—বিনা খরচে সারা ভারতবর্ষটা ঘুরিয়া আসা যায়। আমি হিমালয়ের কোন্ দিকে গিয়াছিলাম, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই,—তবে সেটা দার্জিলিং কিংবা সিমলা পাহাড় নহে। যেখানে গিয়াছিলাম, সে স্থান আরও নির্জন ও দুরধিগম্য; রেলের শেষ সীমা ছাড়াইয়া আরও দশ বারো মাইল রিক্শ কিংবা ঘোড়ায় যাইতে হয়।

হিমালয়ের নৈসর্গিক বর্ণনা করিয়া উত্ত্যক্ত পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাইব না; সচরাচর আশ্বিনমাসে পাহাড়ের অবস্থা যেমন হইয়া থাকে, তাহার অধিক কিছু নহে। গিরিক্রোড়ের এই ক্ষুদ্র জনবিরল শহরটি এমন ভাবে তৈয়ারী যে, মানুষের হাতের কাজ খুব কমই চোখে পড়ে। যে পথটি সর্পিল গতিতে কখনও উঁচু কখনও নিচু হইয়া শহরটিকে নাগপাশে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, পাইন্ গাছের শ্রেণীর দ্বারা তাহা এমনই আচ্ছন্ন যে, তাহার শীর্ণ দেহটি সহসা চোখেই পড়ে না। ছোট ছোট পাথরের বাড়িগুলি পাহাড়ের অঙ্গে মিশিয়া আছে। মাঝে মাঝে পাইনের জঙ্গল, তাহার মধ্যে পাথরের টুকরা বসাইয়া মানুষের বিশ্রামের স্থান করা আছে।

রাত্রিকালে ক্বচিৎ ফেউয়ের ডাক শুনা যায়। শীত চমৎকার উপভোগ্য।

সে দিন পাইন্ গাছের মাথায় চাঁদ উঠিয়াছিল। আধখানা চাঁদ, কিন্তু তাহারই আলোয় বনস্থলী উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আমি একাকী পাইন্.বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। গায়ে ওভার-কোট ছিল, মাথায় একটা অদ্ভুত আকৃতির পশমের টুপি পরিয়াছিলাম। এ দেশের পাহাড়ীরা এইরকম টুপি তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করে। চাঁদের আলোয় আমার দেহের যে ছায়াটা মাটিতে পড়িয়াছিল, তাহা দেখিয়া আমারই হাসি পাইতেছিল। ঠিক একটি জংলী শিকারীর চেহারা,—হাতে একটা ধনুক কিংবা বর্শা থাকিলে আর কোনও তফাত থাকিত না।

এখানে আসিয়া অবধি কোনও বাঙালীর মুখ দেখি নাই, অন্য জাতীয় লোকের সঙ্গেও বিশেষ পরিচয় হয় নাই, তাই একাকী ঘুরিতেছিলাম। বাহিরের শীতশিহরিত তন্দ্রাচ্ছন্ন প্রকৃতি আমাকে গভীর রাত্রিতে ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়াছিল। এই প্রকৃতির পানে চাহিয়া চাহিয়া আমার মনে হইতেছিল, এ-দৃশ্য যেন ইহ-জগতের নহে, কিংবা যেন কোন্ অতীত যুগ হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া এই অর্ধ-ঘুমন্ত দৃশ্যটাকে কেহ এখানে ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে। বর্তমান পৃথিবীর সঙ্গে ইহার কোন যোগ নাই, চন্দ্রাস্ত হইলেই অস্পষ্ট স্বপ্নের মতো ইহা শূন্যে মিলিয়া যাইবে।

এ বন রাত্রিকালে খুব নিরাপদ নহে জানিতাম, ফেউয়ের ডাকও স্বকর্ণে শুনিয়াছি; কিন্তু তবু এক অদৃশ্য মায়া আমাকে ধরিয়া রাখিয়াছিল। কিছুক্ষণ এদিক্-ওদিক্ ঘুরিয়া বেড়াইবার পর একটি গাছের ছায়ায় পাথরের বেদীর উপর বসিয়া পড়িলাম। নিস্তব্ধ রাত্রি। মাঝে মাঝে মৃদু বাতাসে গাছের পাতা অল্প নড়িতেছে;

দু'একটা ফল বৃন্তচ্যুত হইয়া টুপটাপ করিয়া মাটিতে পড়িতেছে। ইহা ছাড়া জগতে আর শব্দ নাই।

আমি ভিন্ন এ-বনে আরও কেহ আছে! বনভূমির উপর আলো ও ছায়ার যে ছক পাতা রহিয়াছে, তাহার উপর একটি নিঃশব্দে সঞ্চরমান শুভ্রমূর্তি মাঝে মাঝে চোখে পড়িতেছে। মূর্তি কখনও তরুচ্ছায়ার অন্ধকারে মিলাইয়া যাইতেছিল, কখনও অবাস্তব কল্পনার মতো চন্দ্রালোক-কুহেলির ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। ক্রমে একটি ক্ষীণ তন্দ্রামধুর কণ্ঠস্বর কানে আসিতে লাগিল,—ঐ ছায়ামূর্তি গান করিতেছে। গানের কথাগুলি ধরা গেল না, কিন্তু সুরটি পরিচিত, যেন পূর্বে কোথায় শুনিয়াছি। ঘুম-পাড়ানী ছড়ার মতো সুর, কিন্তু প্রাণের সমস্ত তন্ত্রী চির-পরিচয়ের আনন্দে ঝংকৃত করিয়া তুলে।

গান ক্রমশ নিকটবর্তী হইতে লাগিল। এই গান যতই কাছে আসিতে লাগিল, আমাব শরীরের স্নায়ুমণ্ডলেও এক অপূর্ব ব্যাপার ঘটিতে আরম্ভ কবিল। সে অবস্থা বর্ণনা করি এমন সাধ্য আমার নাই। সে কি তীব্র অনুভূতি! আনন্দের কোন্ উদ্দামতম অবস্থায় মানুষের শরীরে এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে জানি না, কিন্তু মনে হইল, দেহের স্নায়ুগুলা এবার অসহ্য হর্ষবেগে ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া একাকার হইয়া যাইরে।—যে গান গাহিতেছিল, সে নারী এবং যে ভাষায় গান গাহিতেছিল তাহা বাংলা; কিন্তু সে জন্য নহে। আমার সমস্ত অন্তরাত্মা যে সংক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার অন্য কারণ ছিল। এই গান এই কণ্ঠে গীত হইতে আমি পূর্বে শুনিয়াছি—বহুবার শুনিয়াছি। ইহার প্রত্যেকটি শব্দ আমার কাছে পুরাতন। কিন্তু তফাত এই যে, যে-ভাষায় এ গান পূর্বে শুনিয়াছিলাম, তাহা বাংলাভাষা নহে। সে ভাষা ভুলিয়া

গিয়াছি, কিন্তু গান ভুলি নাই! কোথায় অন্তরের কোন্ নির্জন কন্দরে এতকাল লুকাইয়া ছিল, শুনিবামাত্র প্রতিধ্বনির মতো জাগিয়া উঠিল। গানের কথাগুলি বাংলায় রূপান্তরিত হইয়া অসংযুক্ত ছড়ার মতো প্রতীয়মান হয়, কিন্তু একদিন উহারই ছন্দে আমার বুকের রক্ত নৃত্য করিয়া উঠিত। গানের কথাগুলা এইরূপ ঃ

বনের চিতা মেরেছে মোর স্বামী
ধারালো তীর হেনে!
চামড়া তাহার আমায় দেবে এনে
পরবো গায়ে আমি।
আমার চুলে বিনিয়ে দেব, ওরে,
তার ধনুকের ছিলা,
স্বামী আমার,—নিটোল দেহ তার
কঠিন যেন শিলা!

গায়িকা আরও কাছে আসিতে লাগিল। আমি দাঁড়াইয়া উঠিয়া রোমাঞ্চিত-দেহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। ওঃ, কত কল্পান্ত পরে সে ফিরিয়া আসিল! আমার প্রিয়া—আমার সঙ্গিনী—আমার রুমা! এত দিন কি তাহারই প্রতীক্ষায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিলাম?

যে তরুচ্ছায়ার নিম্নে আমি দাঁড়াইয়াছিলাম, সে গাহিতে গাহিতে ঠিক সেই ছায়ার কিনারায় আসিয়া দাঁড়াইল। আমাকে সে দেখিতে পায় নাই, চাঁদের দিকে চোখ তুলিয়া গাহিল,—

স্বামী আমার,—নিটোল দেহ তার
কঠিন যেন শিলা!

তাহার উন্নমিত মুখের পানে চাহিয়া আর আমার হৃদয় ধৈর্য

মানিল না। আমি বাঘের মতো লাফাইয়া গিয়া তাহার হাত ধরিলাম। কথা বলিতে গেলাম, কিন্তু সহসা কিছুই বলিতে পারিলাম না। যে ভাষায় কথা বলিতে চাই, সে ভাষার একটা শব্দও স্মরণ নাই। অবশেষে অতি কষ্টে যেন অর্ধজ্ঞাত বিদেশী ভাষায় কথা কহিতেছি, এমনই ভাবে বাংলায় বলিলাম, "তুমি রুমা —আমার রুমা !"

তাহার গান থামিয়া গিয়াছিল, সে ভয়-বিস্ফারিত নয়নে চাহিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, "কে ? কে ?"

তাহার মুখের অত্যন্ত কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিলাম, "আমি, আমি! রুমা, চিনতে পারছ না ?"

সভয় ব্যাকুল-কণ্ঠে সে বলিল, "না। কে তুমি ? তোমাকে আমি চিনি না। হাত ছেড়ে দাও !"

জলবিম্ব যেমন তরঙ্গ-আঘাতে ভাঙিয়া যায়, তেমনই এক মুহূর্তে আমার মোহ-বুদ্‌বুদ্‌ ভাঙিয়া গেল। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খাইয়া বর্তমান জগতে ফিরিয়া আসিলাম। তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া লজ্জিত অপ্রতিভ ভাবে বলিলাম, "মাপ করুন। আমার ভুল হয়েছিল।"

রুমা চিত্রার্পিতার মতো স্থির অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। আমিও তাহার পানে চাহিলাম। এই আমার সেই রুমা! পরিধানে সাদা শালের শাড়ি, আর একটি ত্রিকোণ শুভ্র শাল স্কন্ধ বেষ্টন করিয়া বুকের উপর ব্রূচ দিয়া আঁটা, পায়ে সাদা চামড়ার জুতা। মস্তক অনাবৃত, কালো কেশের রাশি কুণ্ডলিত আকারে গ্রীবামূলে লুটাইতেছে। মুখখানি কুমুদের মতো ধবধবে সাদা, বয়স বোধ করি আঠারো-উনিশের বেশী নহে —একটি তরুণী রূপসী শিক্ষিতা বাঙালী মেয়ে।

কিন্তু না, এ আমার সেই রুমা! যাহাকে আমি তাহার স্বজাতির ভিতর হইতে কাড়িয়া আনিয়াছিলাম, যে আমার সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছিল, এ সেই রুমা! আজ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সে আমার কাছে আসিল! আমাকে সে চিনিতে পারিল না?

আমার গলার পেশীগুলি সংকুচিত হইয়া শ্বাসরোধের উপক্রম করিল। আমি রুদ্ধস্বরে আবার বলিয়া উঠিলাম, "রুমা, চিনতে পারছ না?"

রুমা স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল, মোহাবিষ্ট স্বরে কহিল, "আমার নাম রমা।"

"না—না—না, তুমি রুমা! আমার রুমা! মনে নেই, গুহার মধ্যে আমরা থাকতুম, ওপরে পাহাড়, নিচে উপত্যকা? তুমি গান গাইতে —যে গান এখনই গাইছিলে, সেই গান গাইতে, মনে নেই?"

রুমার দুই চক্ষু আরও তন্দ্রাতুর হইয়া আসিল। ঠোঁট দুটি একটু নড়িল, বলিল, "মনে পড়ে না—কবে—কোথায়......"

মাথার টুপিটি অধীরভাবে খুলিয়া ফেলিয়া আমি ব্যগ্রস্বরে কহিতে লাগিলাম, "মনে পড়ে না? সেই উপত্যকায় তোমরা একদল যাযাবর এসেছিলে, তোমাদের সঙ্গে ঘোড়া উট ছিল, তোমরা আগুন জ্বেলে মাংস সিদ্ধ করে খেতে। হ্রদের জলে যে লম্বা ঘাস জন্মাতো, তার শস্য থেকে চাল তৈরি করতে তুমিই যে আমায় শিখিয়েছিলে। ভেড়ার লোম থেকে কাপড় বোনবার কৌশল যে আমি তোমার কাছ থেকেই শিখেছিলুম। মনে পড়ে না? একদিন অন্ধকার রাত্রিতে আমরা তোমাদের আক্রমণ করলুম। তোমার দলের সব পুরুষ মরে গেল! তোমাকে নিয়ে আমি যখন পালাচ্ছিলুম, তুমি লোহার ছুরি দিয়ে আমার কপালে ঠিক এইখানে মারলে!"

কপালের দিকেই রুমা একদৃষ্টে তাকাইয়া ছিল। আমার মনে ছিল না যে, কপালের ঠিক ঐ স্থানটিতেই আমার একটা রক্তবর্ণ জড়ুল আছে। কপালে হাত পড়িতেই স্মরণ হইল, নিজেই চমকিয়া উঠিলাম। বহু পূর্বজন্মে যেখানে রুমার ছুরিকাঘাতে ক্ষত হইয়াছিল, প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় বিধানে ইহজন্মে তাহা রক্তবর্ণ জড়ুলরূপ ধরিয়া দেখা দিয়াছে! রুমা সেই চিহ্নটার দিকে নির্নিমেষনেত্রে চাহিয়া হঠাৎ চিৎকার করিয়া আমার বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, "গাক্কা! গাক্কা!"

গাক্কা! হাঁ, ঐ বিকট শব্দটাই তখন আমার নাম ছিল। বজ্রকঠিন বন্ধনে তাহাকে বুকের ভিতর চাপিয়া লইয়া বলিলাম, "হাঁ, গাক্কা—তোমার গাক্কা। চিনতে পেরেছ, রুমা! ওঃ, আমার জন্মজন্মান্তরের রুমা!"

কতক্ষণ এইভাবে কাটিল, বলিতে পারি না। এক সময় সযত্নে তাহার মুখখানি বুকের উপর হইতে তুলিয়া ধরিয়া দেখিলাম, —রুমা মূর্ছা গিয়াছে।

তিত্তিকে লইয়া হুড়ার সহিত আমার যুদ্ধ অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছিল। তিত্তিকে আমি ভালোবাসিতাম না, তাহাকে দেখিলে আমার বুকের রক্ত গরম হইয়া উঠিত না। কিন্তু সে ছিল আমাদের জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠা যুবতী,—সুন্দরী-কুলের রাণী। আর আমি ছিলাম যুবকদের মধ্যে প্রধান, আমার সমকক্ষ কেহ ছিল না। সুতরাং তিত্তিকে যে আমি গ্রহণ করিব, এ বিষয়ে কাহারও মনে কোনও সন্দেহ ছিল না—আমারও ছিল না।

আমাদের গোষ্ঠীর মধ্যে নারীর সংখ্যা কমিয়া গিয়াছিল। আমরা জোয়ান ছিলাম প্রায় দুই শত, কিন্তু গ্রহণযোগ্যা যুবতী

ছিল মাত্র পঞ্চাশটি। তাই নারী লইয়া যুবকদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদ আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। আমাদের ডাইনী বুড়ী রিকৃখা তাহার গুহার সম্মুখের উঁচু পাথরের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া দুলিয়া দুলিয়া সমস্ত দিন গান করিত—

"আমাদের দেশে মেয়ে নেই! আমাদের ছেলেদের সঙ্গিনী নেই! এ জাত মরবে—এ জাত মরবে। হে পাহাড়ের দেবতা, বর্ষার স্রোতে যেমন পোকা ভেসে আসে, তেমনই অসংখ্য মেয়ে পাঠাও। এ জাত মরবে। মেয়ে নেই— মেয়ে নেই!..."

রিকৃখার দন্তহীন মুখের স্খলিত কথাগুলি গুহার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া অশরীরী দৈববাণীর মতো বাতাসে ঘুরিয়া বেড়াইত।

সঙ্গিনীর জন্য সকলে পরস্পর লড়াই করিত বটে, কিন্তু তিত্তির দেহে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করে নাই। দূর হইতে লোলুপ ক্ষুধার্ত দৃষ্টিতে চাহিয়া সকলে সরিয়া যাইত। তিত্তির রূপ দেখিবার মতো বস্তু ছিল। উজ্জ্বল নব-পল্লবের মতো বর্ণ, কালো হরিণের মতো চোখ, কঠিন নিটোল যৌবনোদ্ভিন্ন দেহ—ন্যগ্রোধপরিমণ্ডলা! তাহার প্রকৃতিও ছিল অতিশয় চপল। সে নির্জন পাহাড়ের মধ্যে গিয়া তরুবেষ্টিত কুঞ্জের মাঝখানে আপন মনে নৃত্য করিত। নৃত্য করিতে করিতে তাহার অজিন শিথিল হইয়া খসিয়া পড়িত, কিন্তু তাহার নৃত্য থামিত না। বৃক্ষগুল্মের অন্তরাল হইতে অদৃশ্য চক্ষু তাহার নিরাবরণ দেহ বিদ্ধ করিত। কিন্তু তিত্তি দেখিয়াও দেখিত না—শুধু নিজ মনে অল্প অল্প হাসিত। সে ছিল কুহকময়ী চিরন্তনী নারী।

আমার মন ছিল শিকারের দিকে, তাই আমি তিত্তিব চপলতা ও স্বৈরাচার গ্রাহ্য করিতাম না। কিন্তু ক্রমে আমারও অসহ্য হইয়া উঠিল। তাহার কারণ হুড়া। হুড়া ছিল আমারই মতো

একজন যুবক, কিন্তু সে অন্যান্য যুবকদের মতো আমাকে ভয় করিত না। সে অত্যন্ত হিংস্র ও ক্রূর-প্রকৃতির ছিল, তাই শক্তিতে আমার সমকক্ষ না হইলেও আমি তাহাকে মনে মনে সম্ভ্রম করিয়া চলিতাম। সেও আমাকে ঘাঁটাইত না, যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিত। কিন্তু তিত্তিকে লইয়া সে এমন ব্যবহার আরম্ভ করিল যে, আমার অহংকারে ভীষণ আঘাত লাগিল। সে নিঃসংকোচে তিত্তির পাশে গিয়া বসিত, তাহার হাত ধরিয়া টানাটানি করিত, চুল ধরিয়া টানিত, তাহাব কান হইতে পাকা বদরী ফলের অবতংস দাঁত দিয়া খুলিয়া খাইয়া ফেলিত। তিত্তিও হাসিত, মারিত, ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত, কিন্তু সত্যকার ক্রোধ প্রকাশ করিয়া হুড়াকে নিরুৎসাহ করিত না।

এইরূপে হুড়ার সহিত আমার লড়াই অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছিল।

সেদিন প্রকাণ্ড একটা বরাহের পিছনে পিছনে বহু উর্ধ্বে পাহাড়ের প্রায় চূড়ার কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। হাতে তীর-ধনুক ছিল। কিন্তু বরাহটাকে মাবিতে পারিলাম না। সোজা যাইতে যাইতে সহসা সে একটা বিবরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। হতাশ হইয়া ফিরিতেছি, এমন সময় চোখে পড়িল, নিচে কিছুদূরে একটি সমতল পাথরের উপর দুটি মানুষ পরস্পরের অত্যন্ত কাছাকাছি বসিয়া আছে। স্থানটি এমনই সুরক্ষিত যে, উপর হইতে ছাড়া অন্য কোনও দিক্ হইতে দেখা যায় না। মানুষ দুটির একটি স্ত্রী, অন্যটি পুরুষ। ইহাবা কে, চিনিতে বিলম্ব হইল না—তিত্তি এবং হুড়া। তিত্তির মাথা হুড়ার স্কন্ধের উপর ন্যস্ত, হুড়ার একটা হাত তিত্তির কোমর জড়াইয়া আছে। দুই জনে মৃদুকণ্ঠে হাসিতেছে ও গল্প করিতেছে।

আমি সাবধানে পিঠ হইতে হরিণের শিঙের তীরটি বাছিয়া লইলাম। এটি আমার সবচেয়ে ভালো তীর, আগাগোড়া হরিণের শিং দিয়া তৈয়ারী, যেমন ধারালো তেমনই ঋজু। এ তীরের লক্ষ্য কখনও ব্যর্থ হয় না। আজ তিত্তি ও হুড়াকে এক তীরে গাঁথিয়া ফেলিব।

ধনুকে তীর সংযোগ করিয়াছি, এমন সময় তিত্তি মুখ ফিরাইয়া উপর দিকে চাহিল। পরক্ষণেই অস্ফুট চিৎকার করিয়া সে বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া একটা প্রস্তর খণ্ডের পিছনে লুকাইল। হুড়াও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, আমাকে দেখিয়া সে হিংস্র জন্তুর মতো দাঁত বাহির করিল; গর্জন করিয়া কহিল, "গাক্কা, তুই চলে যা, আমার কাছে আসিস্ না! আমি তোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবো!"

আমি ধনুঃশর ফেলিয়া নিচে নামিয়া গেলাম, হুড়ার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গর্বিতভাবে বলিলাম, "হুড়া, তুই পালিয়ে যা! আর যদি কখনও তিত্তির গায়ে হাত দিবি, তোর হাত-পা মুচড়ে ভেঙে পাহাড়ের ডগা থেকে ফেলে দেব। পাহাড়ের ফাঁকে মরে পড়ে থাকবি, শকুনি তোর পচা মাংস ছিঁড়ে খাবে।"

হুড়ার চোখ দু'টা রক্তবর্ণ হইয়া ঘুরিতে লাগিল, সে দন্ত কড়মড় করিয়া বলিল, "গাক্কা, তিত্তি আমার! সে তোকে চায় না, আমাকে চায়। তুই যদি তার দিকে তাকাস্, তোর চোখ উপড়ে নেব। কেন এখানে এসেছিস্, চলে যা! তিত্তি আমার, তিত্তি আমার!"—বলিয়া ক্রোধান্ধ হুড়া নিজের বক্ষে সজোরে চপেটাঘাত করিতে লাগিল।

আমি বলিলাম, "তুই তিত্তিকে আমার কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছিস্। যদি পারিস্, কেড়ে নে;—আয়, লড়াই কর্!"

হুড়া দ্বিতীয় আহ্বানের অপেক্ষা করিল না, বন্য শূকরের মতো আমাকে আক্রমণ করিল।

তখন সেই চত্বরের ন্যায় সমতল ভূমির উপর ঘোর যুদ্ধ বাধিল। দুইটি ভল্লুক সহসা ক্ষিপ্ত হইয়া গেলে যে ভাবে যুদ্ধ করে, আমরাও সেই ভাবে যুদ্ধ করিলাম। সেই আদিম যুদ্ধ, যখন নখ-দন্ত ভিন্ন অন্য অস্ত্র প্রয়োজন হইত না। হুড়া কামড়াইয়া আমার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিল, সর্বাঙ্গ দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, শক্তিতে সে আমার সমকক্ষ ছিল না। আমি ধীরে ধীরে তাহাকে নিস্তেজ করিয়া আনিলাম। তারপর তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার পিঠের উপর চড়িয়া বসিলাম।

নিকটেই এক খণ্ড পাথর পড়িয়াছিল। দুই হাতে সেটা তুলিয়া লইয়া হুড়ার মাথা গুঁড়া করিয়া দিবার জন্য ঊর্ধ্বে তুলিয়াছি, হঠাৎ বিকট চিৎকার করিয়া রাক্ষসীর মতো তিত্তি আমার ঘাড়ের উপর লাফাইয়া পড়িল। দুই হাতের আঙুল আমার চোখের মধ্যে পুরিয়া দিয়া প্রখর দন্তে আমার একটা কান কামড়াইয়া ধরিল।

বিস্ময়ে, যন্ত্রণায় আমি হুড়াকে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, তিত্তি কিন্তু গিরগিটির মতো আমার পিঠ আঁকড়াইয়া রহিল। চোখ ছাড়িয়া দিয়া গলা জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু কান ছাড়িল না। ওদিকে হুড়াও ছাড়া পাইয়া সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিল। দুই-জনের মধ্যে পড়িয়া আমার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল।

তিত্তিকে পিঠ হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু বৃথা চেষ্টা। হাত-পা দিয়া সে এমনভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছে যে, সে নাগপাশ হইতে মুক্ত হওয়া একেবারে অসম্ভব। তাহার উপর কান কামড়াইয়া আছে, ছাড়ে না। এ দিকে হুড়া আমার

পরিত্যক্ত প্রস্তরখণ্ডটা তুলিয়া লইয়া আমারই মস্তক চূর্ণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। আমার আর সহ্য হইল না, রণে ভঙ্গ দিলাম। রাক্ষসীটাকে পিঠে করিয়াই পলাইতে আরম্ভ করিলাম।

অসমতল পাহাড়ের উপর একটা উলঙ্গ উন্মত্ত ডাকিনীকে পিঠে লইয়া দৌড়ানো সহজ কথা নহে। কিন্তু কিছুদূর গিয়া সে আপনা হইতেই আমাকে ছাড়িয়া দিল। আমাব কর্ণ ত্যাগ করিয়া পিঠ হইতে পিছলাইয়া নামিয়া পড়িল। আমি আর ফিরিয়া তাকাইলাম না। পিছনে তিত্তি চিৎকার করিয়া হাসিয়া করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল।—

"গাক্কা ভীতু, গাক্কা কাপুরুষ। গাক্কা মরদ নয়! সে কোন্ সাহসে তিত্তিকে পেতে চায়? তিত্তি হুড়ার বৌ! হুড়া তিত্তিকে গাক্কাব কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে, তিত্তির ভয়ে গাক্কা পালিয়েছে। গাক্কা ভীতু! গাক্কাকে দেখে সবাই হাসবে। গাক্কা আর মানুষের কাছে মুখ দেখাবে না। গাক্কা কাপুরুষ! গাক্কা মরদ নয়!"—তিত্তিব এই তীব্র শ্লেষ বক্রোক্তি কর্ণে শুনিতে শুনিতে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে পলাইলাম।

সেই দিন, সূর্য যখন উপত্যকার ওপারে পাহাড়ের আড়ালে ঢাকা পড়িল, তখন আমি চুপি চুপি নিজের গুহা হইতে পাথরের ফলকযুক্ত বর্শাটি লইয়া গোষ্ঠী পরিত্যাগ করিলাম। তিত্তিকে হারাইয়া আমার দুঃখ হয় নাই, কিন্তু গ্রামের সকলে, যাহারা এত কাল আমাকে ভয় করিয়া চলিত, তাহারা আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া উপহাস করিবে, তিত্তি করতালি দিয়া হাসিবে, ইহা সহ্য করা অপেক্ষা গোষ্ঠী ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। উপত্যকার পরপারে ঐ যেখানে সূর্য ঢাকা পড়িল, ওখানে একটি ছোট গুহা আছে,

একদিন শিকার করিতে গিয়া উহা আবিষ্কার করিয়াছিলাম। গুহার পাশ দিয়া একটি সরু ঝরনা নামিয়াছে, তাহার জল চাক-ভাঙা মধুর মতো মিষ্ট। ও দিকে শিকারও বেশী পাওয়া যায়। এদিক্ হইতে তাড়া খাইয়া প্রায় সকল জন্তুই ওদিকে গিয়া জমা হয়, সুতরাং ঐখানে গিয়াই বাস করিব।

গ্রাম ছাড়িয়া যখন চলিয়া আসিতেছি, তখন শুনিতে পাইলাম, বুড়ী ডাইনী রিক্‌খা তাহার চাতালে বসিয়া গাহিতেছে—

"মেয়ে নেই! মেয়ে নেই! আমাদের ছেলেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরছে। এ জাত বাঁচবে না। হে পাহাড়ের দেবতা, মেয়ে পাঠাও..."

উপত্যকা পার হইয়া ও দিকের পাহাড়ে পৌঁছিতে মধ্যরাত্রি অতীত হইয়া গেল। আকাশে চাঁদ ছিল। চাঁদটা ক্রমে ভরাট হইয়া আসিতেছে, দুই-তিন দিনের মধ্যেই নিটোল আকার ধারণ করিবে। এখন শরৎকাল, আকাশে মেঘ সাদা ও হাল্কা হইয়াছে, আর বৃষ্টি পড়ে না। উপত্যকার মাঝখানে হ্রদ,—ঠিক মাঝখানে নহে, একটু পশ্চিম দিক্ ঘেঁষিয়া,—তাহার কিনারায় লম্বা লম্বা ঘাস জন্মিয়াছে। ঘাসের আগায় শীষ গজাইয়া হেলিয়া পড়িয়াছে। আর কিছু দিন পরে ঐ শীষ পীতবর্ণ হইলে উত্তর হইতে পাখিরা আসিতে আরম্ভ করিবে।

হ্রদের ধার দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলাম, হরিণের দল জল পান করিয়া চলিয়া গেল। তাহাদের মসৃণ গায়ে চাঁদের আলো চকচক করিয়া উঠিল। ক্রমে যেখানে আমার ক্ষীণা ঝরনাটি হ্রদের সঙ্গে মিশিয়াছে, সেইখানে আসিয়া পড়িলাম। এ দিকে হ্রদের জল প্রায় পাহাড়ের কোল পর্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে; মধ্যে ব্যবধান পঞ্চাশ হাতের বেশী নহে। সম্মুখেই পাহাড়ের জঙ্ঘার

একটা খাঁজের মধ্যে আমার গুহা। আমি ঝরনার পাশ দিয়া উঠিয়া যখন আমাব নূতন গৃহের সম্মুখে পৌঁছিলাম, তখন চাঁদের অপরিপুষ্ট চক্রটি গুহার পিছনে উচ্চ পাহাড়ের অন্তরালে লুকাইল।

নূতন গৃহে নূতন আবেষ্টনীর মধ্যে আমি একাকী মনের আনন্দে বাস কবিতে লাগিলাম। কাহারও সহিত দেখা হয় না—হবিণেব অন্বেষণেও এদিকে কেহ আসে না। তাহার প্রধান কারণ, পাহাড়-দেবতাব কবাল মুখের এত কাছে কেহ আসিতে সাহস কবে না। আমাদেব জাতির মধ্যে এই চক্রাকৃতি পর্বতশ্রেণী একটি অতিকায় অজগব বলিয়া পবিচিত ছিল, এই অজগরই আমাদের পর্বত-দেবতা। পর্বত-দেবতাব মুখ ছিল দংষ্ট্রাবহুল অন্ধকাব একটা গহ্বব। বস্তুতঃ, দূব হইতে দেখিলে মনে হইত, যেন শল্কাবৃত বিশাল একটা সরীসৃপ কুণ্ডলিত হইয়া তাহার ব্যাদিত মুখটা মাটিব উপব বাখিয়া শুইয়া আছে। প্রাণান্তেও কেহ এই গহ্ববমুখেব কাছে আসিত না।

গ্রীষ্মেব অবসানে যখন আকাশে মেঘ আসিয়া গর্জন করিত, তখন আমাদেব পাহাড়-দেবতাও গর্জন কবিতেন। উপত্যকা জলে ভবিয়া উঠিলে তৃষ্ণার্ত দেবতা ঐ মুখ দিয়া জল শুষিয়া লইতেন। আমাদেব গোষ্ঠী হইতে বর্ষা-ঋতুর প্রাক্‌কালে দেবতার প্রীত্যর্থে জীবন্ত জীবজন্তু উৎসর্গ কবা হইত। দেবতাব মুখের নিকটে কেহ যাইতে সাহসী হইত না—দূব হইতে দেবতাকে উদ্দেশ করিয়া জন্তুগুলা ছাড়িয়া দিত! জন্তুগুলাও দেবতার ক্ষুধিত নিশ্বাসের আকর্ষণে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার মুখে প্রবেশ করিত। দেবতা প্রীত হইয়া তাহাদিগকে ভোজন কবিতেন।

দেবতার এই ভোজনরহস্য কেবল আমি ধরিয়া ফেলিয়াছিলাম; কিন্তু কাহাকেও বলি নাই। আমি দেখিয়াছিলাম, জন্তুগুলা

কিছুকাল পরে দেবতার মুখ হইতে অক্ষত-দেহে বাহির হইয়া আসে এবং স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে করিতে পাহাড়ে ফিরিয়া যায়। পর্বত-দেবতার মুখ যে প্রকৃতপক্ষে একটা বড় গহ্বর ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, তাই তাহার নিকটে যাইতে আমার ভয় করিত না। একবার কৌতূহলী হইয়া উহার ভিতরেও প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু গহ্বরের মুখ প্রশস্ত হইলেও উহার ভিতরটা অত্যন্ত অন্ধকার, এ জন্য বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারি নাই। কিন্তু রন্ধ্র যে বহুদূর বিস্তৃত, তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

এই পাহাড়-দেবতার মুখ আমার গুহা হইতে প্রায় তিন শত হাত দূরে উত্তরে পর্বতের সানুদেশে অবস্থিত। এ প্রান্তে দেবতার ভয়ে কেহ আসে না, অথচ এ দিকে শিকারের যত সুবিধা, অন্য দিকে তত নহে। রাত্রিতে ঝরনা ও হ্রদের মোহানায় লুকাইয়া থাকিলে যত ইচ্ছা শিকার পাওয়া যায়—শিকারের জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না। আমার গুহাটি এমনই চমৎকার যে, অত্যন্ত কাছে আসিলেও ইহাকে গুহা বলিয়া চেনা যায় না। গুহার মুখটি ছোট—লতাপাতা দিয়া ঢাকা; কিন্তু ভিতরটি বেশ সুপ্রসর। ছাদ উঁচু—দাঁড়াইলে মাথা ঠেকে না; মেঝেটি একটি আস্ত সমতল পাথর দিয়া তৈয়ারী। তাহার উপর লম্বাভাবে শুইয়া রন্ধ্রপথে মুখ বাড়াইলে সমস্ত উপত্যকাটি চোখের নিচে বিছাইয়া পড়ে। শীতের সময় একটা পাথর দিয়া স্বচ্ছন্দে গুহামুখ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায়, ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া রাত্রিকালে হিংস্র জন্তুর অতর্কিত আক্রমণও এই উপায়ে প্রতিরোধ করা যায়।

এইখানে নিঃসঙ্গ শান্তিতে আমার কয়েকদিন কাটিয়া গেল। আকাশের চাঁদ নিটোল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়া আবার ক্ষীণ হইতে

হইতে একদিন মিলাইয়া গেল। হ্রদের কিনারায় লম্বা ঘাসের শস্য পাকিয়া রং ধরিতে আরম্ভ করিল। পাখির ঝাঁক একে একে আসিয়া হ্রদের জলে পড়িতে লাগিল; তাহাদের মিলিত কণ্ঠের কলধ্বনি আমার নিশীথ নিদ্রাকে মধুর করিয়া তুলিল।

একদিন অপরাহ্ণে, আমার গুহার পাশে ঝরনা যেখানে পাহাড়ের এক ধাপ হইতে আর এক ধাপে লাফাইয়া পড়িয়াছে, সেই পৈঁঠার উপর বসিয়া আমি একটা নূতন ধনুক নির্মাণ করিতেছিলাম। দুই দিন আগে একটা হরিণ মারিয়াছিলাম, তাহারই অন্ত্রে ধনুকের ছিলা করিব বলিয়া জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলাম। পাহাড়ে একপ্রকার মোটা বেত জন্মায়, তাহাতে খুব ভালো ধনুক হয়, সেই বেত একটা ভাঙিয়া আনিয়া শুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। উপস্থিত আমার বর্শার ধারালো পাথরের ফলা দিয়া তাহারই দুই দিকে গুণ লাগাইবার খাঁজ কাটিতেছিলাম। অস্তমান সূর্যের আলো আমার ঝরনার জলে রক্ত মাখাইয়া দিয়াছিল; নিচে হ্রদের জলে পাখিগুলি ডাকাডাকি করিতেছিল। ঝরনার চূর্ণ জলকণা নিচের ধাপ হইতে বাষ্পাকারে উঠিয়া অত্যন্ত মিঠাভাবে আমার অনাবৃত অঙ্গে লাগিতেছিল। মুখ নত করিয়া আমি আপন মনে ধনুকে গুণ-সংযোগে নিযুক্ত ছিলাম।

হঠাৎ একটা অশ্রুতপূর্ব চিঁহি-চিঁহি শব্দে চোখ তুলিয়া উপত্যকার দিকে চাহিতেই বিস্ময়ে একেবারে নিস্পন্দ হইয়া গেলাম। এ কি! দেখিলাম, পাহাড়-দেবতার মুখবিবর হইতে পিপীলিকা-শ্রেণীর মতো একজাতীয় অদ্ভুত মানুষ ও ততোধিক অদ্ভুত জন্তু বাহির হইতেছে। এরূপ মানুষ ও এরূপ জন্তু জীবনে কখনও দেখি নাই।

আগন্তুকগণ বহু নিম্নে উপত্যকায় ছিল, অতদূর হইতে আমাকে দেখিতে পাইবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি আমি সন্তর্পণে বুকে হাঁটিয়া ঝরনার তীর হইতে আমার গুহায় ফিরিয়া আসিয়া লুকাইলাম। গুহার মধ্যে লুকাইয়া দ্বারপথে মুখ বাড়াইয়া নবাগতদিগকে দেখিতে লাগিলাম।

মানুষ হইলেও ইহারা যে আমার সগোত্র নহে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। বাহিরের কোনও অজ্ঞাত জগৎ হইতে রন্ধ্রপথে আমাদের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে, তাহাও অস্পষ্টভাবে অনুভব করিলাম। কিন্তু যেখান হইতেই আসুক, এমন আশ্চর্য চেহারা ও বেশভূষা যে হইতে পারে তাহা কখনও কল্পনা করি নাই। জন্তুদের কথা পরে বলিব, প্রথমে মানুষগুলার কথা বলি। এই মানুষগুলার গায়ের রং আমাদের মতো মধুপিঙ্গল বর্ণ নহে— ধবধবে সাদা। ইহাদের চুল সূর্যাস্তের বর্ণচ্ছটার ন্যায় উজ্জ্বল, দেহ অতিশয় দীর্ঘ ও সুগঠিত। পশুচর্মের পরিবর্তে ইহাদের দেহ একপ্রকার শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত। ইহারা সংখ্যায় সর্বসুদ্ধ প্রায় একশত জন ছিল, তাহার মধ্যে অর্ধেক নারী। নারীগণও পুরুষদের মতো উজ্জ্বল কেশযুক্ত ও দীর্ঘাকৃতি। তাহারা বস্ত্র দ্বারা বক্ষোদেশ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। পুরুষদের হাতে ধনুর্বাণ ও ভল্ল আছে, ভল্লের ফলা · সূর্যের আলোয় ঝকমক করিতেছে। বর্শার ফলা এমন ঝকমক করিতে পূর্বে কখনও দেখি নাই।

ইহাদের সঙ্গে তিন প্রকার জন্তু রহিয়াছে। প্রথমতঃ, এক-প্রকার বিশাল অথচ শীর্ণকায় জন্তু,—তাহাদের পিঙ্গলবর্ণ দেহ আশ্চর্যভাবে ঢেউখেলানো; দেহের সন্ধিগুলা যেন অত্যন্ত অযত্ন সহকারে সংযুক্ত হইয়াছে, মুখ কদাকার। পিঠের উপর প্রকাণ্ড কুঁজ। ইহাদের পৃষ্ঠে নানাপ্রকার দ্রব্য চাপানো রহিয়াছে।

উদ্‌গ্রীবভাবে গলা বাড়াইয়া ইহারা মন্থরগতিতে চলিয়াছে। দ্বিতীয় জাতীয় জন্তু ইহাদের অপেক্ষা অনেক ছোট, তাহাদের দেহ রোমশ ও রক্তবর্ণ, আঁটসাট মজবুত গঠন। ইহারা দেখিতে ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু পৃষ্ঠে বড় বড় বোঝা বহন করিয়া চলিয়াছে। উপরন্তু বহু মনুষ্য-শিশুও ইহাদের পিঠের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। এই জন্তুগুলাই গুহামুখ হইতে হ্রদ দেখিয়া অদ্ভুত শব্দ করিয়াছিল।

তৃতীয় শ্রেণীর জন্তু সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, দেখিতে কতকটা পাহাড়ী ছাগের মতো, কিন্তু ইহাদের দেহ ঘন রোমে আবৃত। এমন কি, ইহাদের রোম পেটের নিচে পর্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। ইহারা একসঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষিভাবে চলিয়াছে ও মাঝে মাঝে 'ব্যা-ব্যা' শব্দ করিতেছে।

এই সকল জন্তুর আচবণে সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বস্তু এই যে, ইহারা মানুষ দেখিয়া তিলমাত্র ভয় পাইতেছে না, বরং মানুষের সঙ্গে পবম ঘনিষ্ঠভাবে মিলিয়া মিশিয়া চলিয়াছে। মানুষ ও বন্যপশুব মধ্যে এরূপ প্রীতির সম্পর্ক স্থাপিত হইতে এই প্রথম দেখিলাম।

আগন্তুকের দল গুহাবিবর হইতে বাহির হইয়াই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিল। মানুষগুলা হস্ত ঊর্ধ্বে তুলিয়া নানাপ্রকার বিস্ময়সূচক অঙ্গভঙ্গি করিতেছিল ও উত্তেজিতভাবে পরস্পরের সহিত কথা কহিতেছিল। তাহাদের কথা এতদূর হইতে শুনিতে পাইলাম না, কিন্তু তাহারা এই উপত্যকার সন্ধান পাইয়া যে বিশেষ আনন্দিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হইল না। তাহাদের মধ্যে একজন হ্রদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তারস্বরে একটা শব্দ বারংবার উচ্চারণ করিতেছিল, শুধু তাহাই ক্ষীণভাবে কানে আসিল—"বিহি,

বিহিঁ!" বোধ হইল যেন হ্রদের ধারে লম্বা ঘাসগুলাকে লক্ষ্য করিয়া সে ঐ কথাটা বলিতেছে।

ইহারা স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া কিছুক্ষণ কি জল্পনা করিল, তারপর সদলবলে আমার ঝরনার মোহানার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বুঝিলাম, তাহারা এই স্থানেই ডেরা-ডাণ্ডা গাড়িবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছে।

ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। দিবাশেষের নির্বাপিতপ্রায় আলোকে ইহারা ঠিক আমার গুহার নিম্নে—ঝরনার জল যেখানে পাহাড় হইতে নামিয়া স্বচ্ছ অগভীর স্রোতে উপত্যকার উপর দিয়া বহিয়া গিয়া হ্রদের জলে মিশিয়াছে, সেই স্থানে আসিয়া পশুগুলির পৃষ্ঠ হইতে ভাব নামাইল। ভারমুক্ত পশুগুলি ঝরনার প্রবাহের পাশে কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া তৃষ্ণার্তভাবে জল পান করিতে লাগিল।

ইহারা আমার এত কাছে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, এই প্রদোষালোকেও আমি প্রত্যেকের মুখ স্পষ্ট দেখিতে পাইতে-ছিলাম। আমার গুহা হইতে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে বোধ কবি তাহাদের মাথায় ফেলিতে পারিতাম। তাহাদের কথাবার্তাও স্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম, কিন্তু এক বর্ণও বোধগম্য হইতেছিল না।

বাত্রি হইল। তখন ইহারা এক আশ্চর্য ব্যাপাব করিল। একখণ্ড পাথরের সহিত আর একখণ্ড অজ্ঞাত পদার্থ ঠোকাঠুকি করিয়া স্তূপীকৃত শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংযোগ কবিল। অগ্নি জ্বলিয়া অঙ্গারে পরিণত হইলে সেই অঙ্গারে মাংস পুড়াইয়া সকলে আহার করিতে লাগিল। দগ্ধ মাংসের একপ্রকার অপূর্ব গন্ধ আমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়া জিহ্বাকে লালায়িত করিয়া তুলিল।

রাত্রি গভীর হইলে ইহারা পশুগুলির দ্বারা অগ্নির চারিপাশে

একটি বৃহৎ চক্রব্যূহ রচনা করিল, তারপর সেই চক্রের ভিতর অগ্নির পাশে শয়ন করিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কেবল একজন লোক ধনুর্বাণ হাতে লইয়া ব্যূহের বাহিরে পরিক্রমণ করিতে লাগিল।

ইহারা ঘুমাইল বটে, কিন্তু বিস্ময়ে উত্তেজনায় আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া রহিলাম। এই বিচিত্র জাতির অতি বিস্ময়কর আচার-ব্যবহার মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে তাহাদের ক্রমশ নির্বাণোন্মুখ অগ্নির দিকে চাহিয়া রাত্রি কাটাইয়া দিলাম।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই আগন্তুকরা কাজে লাগিয়া গেল। ইহারা অসাধারণ উদ্যমী; একদল পুরুষ উপত্যকার উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বড় বড় পাথরের টুকরা গড়াইয়া আনিয়া প্রাচীর-নির্মাণে প্রবৃত্ত হইল, আর একদল ধনুর্বাণ-হস্তে শিকারের অন্বেষণে পাহাড়ে উঠিয়া গেল। অবশিষ্ট অল্পবয়স্ক বালকগণ পশুগুলাকে লইয়া উপত্যকার শষ্পাচ্ছাদিত অংশে চরাইতে লইয়া গেল। স্ত্রীলোকরাও অলসভাবে বসিয়া রহিল না, তাহারা হ্রদের জলে নামিয়া লম্বা ঘাসের পাকা শীষগুলি কাটিয়া আনিয়া রৌদ্রে শুকাইতে লাগিল। এইরূপে মৌমাছি-পরিপূর্ণ মধুচক্রের মতো এই ক্ষুদ্র সম্প্রদায় কর্ম-প্রেরণায় চঞ্চল হইয়া উঠিল।

দেখিতে দেখিতে আমার দৃষ্টির সম্মুখে চক্রাকৃতি প্রস্তর-প্রাচীর গড়িয়া উঠিল। সন্ধ্যার পূর্বেই প্রাচীর কোমর পর্যন্ত উঁচু হইল। কেবল হ্রদের দিকে দুই হস্ত-পরিমিত স্থান নির্গমনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হইল। সন্ধ্যার সময় শিকারীরা একটা বড় হরিণ ও দু'টা শূকর মারিয়া বর্শাদণ্ডে ঝুলাইয়া লইয়া আসিল। তখন সকলে আনন্দ-কোলাহল সহকারে অগ্নি জ্বালিয়া সেই মাংস দগ্ধ করিয়া আহারের আয়োজন করিতে লাগিল।

আর একটা অভিনব ব্যাপার লক্ষ্য করিলাম। নারীগণ এক-প্রকার বর্তুলাকৃতি পাত্র কক্ষে লইয়া ঝরনার তীরে আসিতেছে এবং সেই পাত্রে জল ভরিয়া পুনশ্চ কক্ষে করিয়া লইয়া যাইতেছে। ইহারা কেহই ঝরনায় মুখ ডুবাইয়া কিংবা অঞ্জলি করিয়া জল পান করে না, প্রয়োজন হইলে সেই পাত্র হইতে জল ঢালিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে।

আর একটা রাত্রি কাটিয়া গেল, নবাগতগণ উপনিবেশ স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিল। ভাব দেখিয়া বোধ হইল, এই উপত্যকাটি তাহাদের বড়ই পছন্দ হইয়াছে, সুতরাং এ স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার আশু অভিপ্রায় তাহাদের নাই। আর একটা মনুষ্য জাতি যে সন্নিকটেই বাস করিতেছে, তাহা তাহারা জানিতে পারে নাই; এবং সেই জাতির এক পলাতক যুবা যে অলক্ষ্যে থাকিয়া অহরহ তাহাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতেছে, তাহা সন্দেহ করিবারও কোনও উপলক্ষ হয় নাই। দিনের বেলা আলো থাকিতে আমি কদাচ গুহা হইতে বাহির হইতাম না।

এইরূপে আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। বরাহদন্তের মতো বাঁকা চাঁদ আবার পশ্চিম আকাশে দেখা দিল।

ইহাদের মধ্যে যে-সব রমণী ছিল, তাহারা সকলেই সমর্থা; বৃদ্ধা বা অকর্মণ্যা কেহ ছিল না। নারীগণ অধিকাংশই সন্তানবতী এবং কোনও-না-কোনও পুরুষের বশবর্তিনী; কিন্তু কয়েকটি আসন্ন-যৌবনা কিশোরী কুমারীও ছিল। ইহাদের ভিতর একটি কিশোরী প্রথম হইতেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

এই কিশোরীর নাম আমি জানিতে পারিয়াছিলাম,—রুমা। রুমা বলিয়া ডাকিলেই সে সাড়া দিত। রুমার রূপ কেমন ছিল,

তাহা আমি বলিতে পারিব না। যে-চোখে দেখিলে নিরপেক্ষ রূপবিচার সম্ভব হয়, আমি তাহাকে সে-চোখে দেখি নাই। আমি তাহাকে দেখিয়াছিলাম যৌবনের চক্ষু দিয়া—লোভের চক্ষু দিয়া। আমার কাছে সে ছিল আকাশের ঐ আভুগ্ন চন্দ্রকলাটির মতো সুন্দর। তিত্তি তাহার পায়ের নখের কাছে লাগিত না।

এই রুমার চরিত্র অন্যান্য বালিকা হইতে কিছু স্বতন্ত্র ছিল। কৈশোরের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া সে প্রায় যৌবনের প্রান্তে পদার্পণ করিয়াছিল, তাই তাহার চরিত্রে উভয় অবস্থার বিচিত্র সম্মিলন হইয়াছিল। সে অন্যান্য নাবীদের সঙ্গে যথারীতি কাজ কবিত বটে, কিন্তু একটু ফাঁক পাইলেই লুকাইয়া খেলা করিয়া লইত। তাহাব সঙ্গিনী বা সখী কেহ ছিল না, সে একাকী খেলা করিতে ভালোবাসিত। কখনও হ্রদেব জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিত, সাঁতার কাটিতে কাটিতে বহুদূর পর্যন্ত চলিয়া যাইত। তাহাকে আসিতে দেখিয়া জলে ভাসমান পাখিগুলি উড়িয়া আর একস্থানে গিয়া বসিত। সে জলে ডুব দিয়া একেবারে তাহাদের মধ্যে গিয়া মাথা তুলিত, তখন পাখিরা ভয়সূচক শব্দ করিয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইত।

কিন্তু এ খেলাও তাহার মনঃপূত হইত না। কারণ, তাহার দেখাদেখি অন্যান্য বালক-বালিকারা জলে পড়িয়া সাঁতার দিতে আবম্ভ করিত। সে তখন জল হইতে উঠিয়া সিক্ত কেশজাল হইতে জলবিন্দু মোচন করিতে করিতে অন্যত্র প্রস্থান করিত।

কখনও একটু অবসর পাইলে সে চুপি চুপি কোনও পুরুষের পরিত্যক্ত ধনুর্বাণ লইয়া পাহাড়ে উঠিয়া যাইত। আমি কিছুক্ষণ তাহাকে দেখিতে পাইতাম না, তারপর আবার সে চুপি চুপি ফিরিয়া আসিত। দেখিতাম, চুলে বনফুলের গুচ্ছ পরিয়াছে, কর্ণে

পক্ব ফলের দুল দুলাইয়াছে, কটিতে পুষ্পিত লতা জড়াইয়া দেহের অপূর্ব প্রসাধন করিয়াছে। ভীরু হরিণীর মতো এদিক্-ওদিক্ চাহিয়া জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিত, তারপর ঈষৎ হাসিয়া ত্রস্ত চকিত পদে প্রস্থান করিত। আমি লক্ষ্য করিয়াছিলাম, সকলের অজ্ঞাতে একাকিনী কোনও কাজ করিতে পারিলেই সে খুশী হয়। ইহা যে তাহার বয়ঃসন্ধির একটা স্বভাবধর্ম, তাহা তখনও বুঝি নাই। কিন্তু আমার ব্যগ্র লোলুপ চক্ষু সর্বদাই তাহার পিছনে পিছনে ঘুরিতে থাকিত। এমন কি, রাত্রিকালে প্রস্তরব্যূহের মধ্যে ঠিক কোন্ স্থানটিতে সে শয়ন করিয়া ঘুমায়, তাহা পর্যন্ত আমাব দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই।

পাখিরা যেমন খড়কুটা দিয়া গাছের ডালে বাসা তৈয়ার কবে, ইহারাও তেমনই গাছের ডালপালা দিয়া ব্যূহের মধ্যে একপ্রকার কোটর নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বোধ হয় অধিক শীতের সময় উহার মধ্যে রাত্রিবাস করিবার সংকল্প ছিল। কিন্তু সেগুলিব নির্মাণ তখনও শেষ হয় নাই, তাই উপস্থিত মুক্ত আকাশের তলেই শয়ন কবিতেছিল।

ইহাদের আগমনের পঞ্চম দিনই বিশেষ স্মরণীয় দিন। আমার মনের মধ্যে যে অভিসন্ধি কয়েকদিন ধরিয়া ধীরে ধীবে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল, সেইদিন মধ্যরাত্রি উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই যে তাহা এমন অচিন্তনীয়ভাবে ফলবান হইয়া উঠিবে, তাহা কে কল্পনা করিয়াছিল? আগন্তুকদের নির্ভয় অসন্দিগ্ধ চিত্তে কোনও অমঙ্গলের ছায়াপাত পর্যন্ত হয় নাই। এ রাজ্যে যে অন্য মানুষ আছে, এ সন্দেহই তাহাদের মনে উদয় হয় নাই।

সেদিন দ্বিপ্রহরে পুরুষেরা সকলে নানা কার্য উপলক্ষে বাহিরে গিয়াছিল। এক দল শিকারে বাহির হইয়াছিল, আর এক দল

কাষ্ঠ আহরণের জন্য পর্বতপৃষ্ঠস্থ জঙ্গলে প্রবেশ করিয়াছিল। বালকেরা পশুগুলিকে চরাইতে লইয়া গিয়াছিল। নারীগণ শিশু কোলে লইয়া অর্ধ-নির্মিত দারু-কোটরের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। হ্রদের জলে সূর্যকিরণ পড়িয়া চতুর্দিকে প্রতিফলিত হইতেছিল ও জল হইতে একপ্রকার সূক্ষ্ম বাষ্প উত্থিত হইতেছিল।

আমি অভ্যাসমত গুহামুখে শয়ান হইয়া ভাবিতেছিলাম, রুমাকে যদি হাতের কাছে পাই, তাহা হইলে চুরি করি। রাত্রিতে যে-সময় উহারা ঘুমায়, সে-সময় যদি চুরি করিয়া আনিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভালো হইত। কিন্তু একটা লোক সমস্ত রাত্রি জাগিয়া পাহারা দেয়, তাহার উপর আবার আগুন জ্বলে। লোকটাকে তীর মারিয়া নিঃশব্দে মারিয়া ফেলিতে পারি—কেহ জানিবে না; কিন্তু আগুনের আলোয় চুরি করিতে গেলেই ধরা পড়িয়া যাইব। তার চেয়ে রুমাকে কোনও সময়ে যদি একেলা পাই,—সন্ধ্যার সময় নির্জনে যদি আমার গুহার কাছে আসিয়া পড়ে, তবে তাহাকে হরণ কবিয়া লইয়া পলায়ন করি। এ গুহা ছাড়িয়া তাহাকে লইয়া এমন স্থানে গিয়া লুকাইয়া থাকি যে, তাহার জাতি-গোষ্ঠীর কেহ আমাদের খুঁজিয়া পাইবে না।

সূর্যতাপে গুহার বায়ু উত্তপ্ত হইয়াছিল, আমি তৃষ্ণাবোধ করিতে লাগিলাম। পাশেই নির্ঝরিণী, গুহা হইতে বাহির হইয়া দুই পদ অগ্রসর হইলেই শীতল জল পাওয়া যায়; কিন্তু গুহার বাহিরে যাইলে পাছে নিম্নস্থ কাহারও দৃষ্টিপথে পড়িয়া যাই, এই ভয়ে ইতস্তত: করিতে লাগিলাম। কিন্তু তৃষ্ণা ক্রমে প্রবলতর হইতে লাগিল, তখন সরীসৃপের মতো বুকে হাঁটিয়া বাহির হইলাম। উঠিয়া দাঁড়ানো অসম্ভব, দাঁড়াইলেই এ দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। আমি সন্তর্পণে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঝরনার দিকে অগ্রসর

হইবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় এক অপ্রত্যাশিত বাধা পাইয়া দ্রুত নিজের কোটরে ফিরিয়া আসিয়া লুকাইলাম।

ঝরনার ধার দিয়া দিয়া রুমা উপরে উঠিয়া আসিতেছে। গুহা-মুখের লতাপাতার আড়ালে থাকিয়া আমি স্পন্দিতবক্ষে দেখিতে লাগিলাম। সে ধাপে ধাপে লাফাইয়া যেখানে ঝরনার জল প্রপাতের মতো নিচে পড়িয়াছে, সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

পূর্বে বলিয়াছি, আমার গুহার পাশেই ঝরনার জল প্রপাতের মতো নিচে পড়িয়াছে। যেখানে এই প্রপাত সবেগে উচ্ছলিত হইয়া পতিত হইয়াছে, সেইখানে পাথরের মাঝখানে একটি গোলাকার কুণ্ড সৃষ্টি করিয়াছিল। এই নাতিগভীর গর্তটি পরিপূর্ণ করিয়া স্বচ্ছ জল আবার নিচের দিকে গড়াইয়া পড়িতেছিল। রুমা এই স্থানে আসিয়া দাঁড়াইল। একবার সতর্কভাবে চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কক্ষ হইতে বর্তুলাকৃতি জলপাত্রটি নামা[illegible]ইয়া রাখিল, তারপর ধীরে ধীরে দেহের বস্ত্র উন্মোচন [illegible]রিতে লাগিল।

অসন্দিগ্ধচিত্তা হরিণীর পানে অদূরবর্তী চি[illegible] বাঘ যেরূপ লোলুপ ক্ষুধিতভাবে চাহিয়া থাকে, আমি[illegible] সেইভাবে তাহাকে দেখিতে লাগিলাম। মধ্যাহ্নের [illegible] সূর্যকিরণে তাহার শুভ্র যৌবনকঠিন দেহ হইতে যেন [illegible] লাবণ্যের ছটা বিকীর্ণ হইতেছিল। বস্ত্র খুলিয়া ফেলিয়া[illegible] সে অলসভাবে দুই বাহু তুলিয়া তাহার সোমলতার মতো উজ্জ্বল কেশজাল জড়াইতে লাগিল। তাবপর শূকরদন্তের মতো বাঁকা তীক্ষ্ণাগ্র একটা ঝকঝকে অস্ত্র পরিত্যক্ত বস্ত্রের ভিতর হইতে তুলিয়া লইয়া চুলের মধ্যে গুঁজিয়া দিল।

এইরূপে কুণ্ডলিত কুন্তলভার সংবরণ করিয়া রুমা শিলাপট্টের উপর হইতে ঝুঁকিয়া বোধ করি জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিবার

রক্ত চায়! এ জাত বাঁচবে না, এ জাত মরবে! দেবতা রক্ত চায়—জোয়ানের তাজা রক্ত! কে রক্ত দেবে—কে দেবতাকে খুশী করবে? এ জাত মরবে—মেয়ে নেই! এ জাত মরবে—দেবতা রক্ত চায়! হে দেবতা, খুশী হও, তোমার মুখের আগুন নিবিয়ে দাও! মেয়ে পাঠাও, মেয়ে পাঠাও!"···

রিক্‌খার গুহা গ্রামের এক প্রান্তে। চুপি চুপি পিছন হইতে গিয়া তাহার কানের কাছে বলিলাম, "রিক্‌খা, দেবতা তোর কথা শুনেছে—মেয়ে পাঠিয়েছে!"

রিক্‌খা চমকিয়া ফিরিয়া বলিল, "গাক্কা! তুই ফিরে এলি? ভেবেছিলাম, দেবতা তোকে নিয়েছে—কি বললি—আমার কথা দেবতা শুনেছে?"

"হ্যাঁ, শুনেছে। দেবতা অনেক মেয়ে পাঠিয়েছে।···শোন্ রিক্‌খা, গাঁয়ের ছেলেদের গিয়ে বল্ যে, পাহাড়-দেবতার মুখ থেকে একপাল মানুষ বেরিয়েছে—তাদের মধ্যে অর্ধেক মেয়ে। রাত্রে উপত্যকার ও-ধারে যেখানে আগুন জ্বলে, সেইখানে ওরা থাকে। মেয়েদের চেহারা ঠিক ঐ চাঁদের মতো,—নীল তাদের চোখ, চুলে আলো ঠিক্‌রে পড়ে। আমি দেখেছি। তুই ছেলেদের বল্, যদি বৌ চায় আমার সঙ্গে আসুক। আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবো। আমাদের গাঁয়ে যত জোয়ান আছে, সবাইকে ডাক্। আজ রাত্তিরেই আমরা পুরুষগুলোকে মেরে ফেলে মেয়েদের কেড়ে নেব!"

আকাশের খণ্ডচন্দ্র তখন অস্ত গিয়াছে। আমরা প্রায় দুই শত জোয়ান অন্ধকারে গা ঢাকিয়া নিঃশব্দে আগন্তুকদের গৃহপ্রাচীরের নিকটে উপস্থিত হইলাম। প্রাচীরের মধ্যে সকলে সুপ্ত—কোথাও শব্দ নাই। ধুনির আগুন জ্বলিয়া সূক্ষ্ম ভস্ম আবরণে ঢাকা পড়িয়াছে।

তাহারই অস্ফুট আলোকে দেখিলাম, ছায়ামূর্তির মতো চারি জন প্রহরী সশস্ত্রভাবে প্রাচীরের বাহিরে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। বুঝিলাম আজ দ্বিপ্রহরে আমাকে দেখিবার পর ইহারা সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছে।

পূর্ব হইতেই স্থির ছিল। আমরা চারিজন তীরন্দাজ এক একটি প্রহরীকে বাছিয়া লইলাম। একসঙ্গে চারিটি ধনুকে টংকার-ধ্বনি হইল—অন্ধকারে চারিটি তীর ছুটিয়া গেল। আমার তীর প্রহরীর কণ্ঠে প্রবেশ করিয়া অপর দিকে ফুঁড়িয়া বাহির হইল। নিঃশব্দে প্রহরী ভূপতিত হইল।

তারপর বিকট কোলাহল করিয়া সকলে প্রাচীর আক্রমণ করিল। নৈশ নিস্তব্ধতা সহসা শতধা ভিন্ন হইয়া গেল।

আমি জানিতাম ব্যূহের কোন্ দিকে রুমা শয়ন করে। আমি সেই দিকে গিয়া প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া দেখিলাম, ভিতরে সকলে জাগিয়া উঠিয়াছে, পুরুষগণ অস্ত্র লইয়া ব্যূহ-প্রাচীরের দিকে ছুটিতেছে। একজন পুরুষ দীর্ঘ বল্লম-আঘাতে অগ্নির ভস্মাচ্ছাদন দূর করিয়া দিল, অমনই লেলিহান্ আরক্তচ্ছটায় দিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

প্রাচীর উল্লঙ্ঘন কবিবার পর রুমাকে যখন দেখিতে পাইলাম, তখন সে সদ্য নিদ্রা হইতে উঠিয়া হতবুদ্ধির মতো ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছে, তাহার চারিপাশে সদ্যোত্থিতা নারীগণ আর্ত-ক্রন্দন করিতেছে। আমি লাফাইয়া গিয়া রুমার উপর পড়িলাম, তাহাকে দুই হাতে তুলিয়া লইয়া কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। কয়েক পদ যাইতে না-যাইতে দেখিলাম, একজন পুরুষ শাণিত দীর্ঘ অস্ত্র উত্তোলিত করিয়া আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে। রুমাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আমি ক্ষিপ্রহস্তে মাটি

হইতে একখণ্ড পাথর তুলিয়া লইয়া তাহাকে ছুঁড়িয়া মারিলাম। মস্তকে আঘাত লাগিয়া সে মৃতবৎ পড়িয়া গেল। রুমা চিৎকার করিয়া উঠিল। আমি আবার তাহাকে কাঁধে ফেলিয়া ছুটিলাম।

আমাদের দলের অন্য সকলে তখন প্রাচীর ডিঙাইয়া ভিতরে ঢুকিয়াছে—ব্যূহের কেন্দ্রস্থলে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছে। দুই পক্ষেরই মানুষ পড়িতেছে, মরিতেছে—কেহ আহত হইয়া বিকট কাতরোক্তি করিতেছে। আমি দ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সেখানে জীবিত কেহ নাই, কয়েকটি রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া আছে। দ্বার অতিক্রম করিতে যাইতেছি, এমন সময় রুমা সহসা যেন মোহনিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিল। নিজের কেশের মধ্যে হাত দিয়া সেই উজ্জ্বল বাঁকা অস্ত্রটা বাহির করিল, তারপর ক্ষিপ্তের মতো চিৎকার করিয়া আমার কপালের পাশে সজোরে বসাইয়া দিল।

কপাল হইতে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল। আমি আবার তাহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিলাম। তাহাব হাত হইতে অস্ত্রটা কাড়িয়া লইয়া তাহাকে নির্দয়ভাবে মাটিতে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, "তুই আমার বৌ! তুই আমার রুমা! এই রক্ত দিয়ে আমি তোকে আমাব কবে নিলাম!"—বলিয়া আমার ললাটস্রুত রক্ত হাতে করিয়া তাহার কপালে চুলে মাখাইয়া দিলাম।

ওদিকে তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে—বিপক্ষ দলের একটি পুরুষও জীবিত নাই। আমাদের দলের যাহারা বাঁচিয়া আছে, তাহারা রক্তলিপ্ত দেহে উন্মত্ত গর্জন করিয়া নারীদের অভিমুখে ছুটিয়াছে।

———